HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – জনসংখ্যা

টপিক – ০১ জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান
টপিক ০২: অভিগমন
টপিক ০৩: অভিগমনের কারণ
টপিক ০৪: অভিগমনের ধরন
টপিক ০৫: অভিগমনের প্রভাব
টপিক ০৬: বাংলাদেশের জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য: জন্মহার, মৃত্যুহার, বৃদ্ধিহার, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অভিগমন
টপিক ০৭: জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল
টপিক ০৮: জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল ও বাংলাদেশ
টপিক ০৯: ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ
টপিক ১০: বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্যের কারণ

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১১: বাংলাদেশে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির প্রভাব
টপিক ১২: প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক
টপিক ১৩: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৪: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

জনসংখ্যা (Population)

কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাকে জনসংখ্যা বলা হয়। এক কথায় একটি দেশের মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগত পরিমাণই জনসংখ্যা। অর্থাৎ, কোনো দেশের জনসংখ্যা বলতে বোঝায়-

"The total number of individuals living in a specific area, whether it is a city, country or the entire world.

Or, "The complete set group of individuals, whether that group comprises a nation or a group of people with a common characteristics"

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

চিত্র-২.১: জনসংখ্যা

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

জনমিতি (Demographics)

জনমিতি শব্দটির আভিধানিক অথ 'জন মিতি' শব্দদ্বয়ের অর্থ দ্বারা বুঝানো যায়, যেমন- জন অর্থ মানুষ বা জনসংখ্যা এবং মিতি অর্থ পরিমাপ (গ্রিক 'Demo' অর্থ জনসংখ্যা এবং 'graphia') অর্থ বর্ণনার। অর্থাৎ, জনমিতি শব্দটি ভৌগোলিক ব্যাখ্যায় এভাবে বর্ণনা করা যায় "কোনো নির্দিষ্ট জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক, পরিমাপের মাধ্যমে উপস্থাপন করাই জনমিতি"।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জনসংখ্যায় বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- কোথাও জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি, কোথাও কম; আবার কোথাও জন্মহার বেশি, কোথাও জন্মহার কম ইত্যাদি নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি আবার নানারকম ভৌগোলিক অবস্থা যেমন ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সম্পদ ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এর ফলে স্থানভেদে জনসংখ্যারও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

জনশুমারির মাধ্যমে সরেজমিনে লোক গণনা করে কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বাংলাদেশে প্রতি দশ বছরে একবার জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

জনসংখ্যা ও এর বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এর সুবিন্যাস্ত ও রীতিবন্ধ আলোচনাই জনসংখ্যা ভূগোলের মূল আলোচ্য বিষয়। সুতরাং জনমিতিক উপাদানের বিশ্লেষণ ছাড়া জনসংখ্যা ভূগোলের আলোচনা বা একটি দেশের জনসংখ্যার গুণগত মান উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ কখনই সম্ভব হয় না।

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান (Demographic Elements of Population)

জনমিতি হচ্ছে জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগত জ্ঞান। জনমিতিতে জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তনের গাণিতিক বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। জনমিতিতে জনসংখ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো হচ্ছে-

১. আকার (Population Size): জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদানগুলোর মধ্যে এর আকারগত বৈশিষ্ট্য সর্বাগ্রে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জনসংখ্যার আকার বলতে কোনো একক অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত মানুষের মোটসংখ্যা বোঝানো হয়ে থাকে। বিশ্ব ব্যাংক এর এক তথ্যে দেখা যায় যে, ১৯৯০ সালে সমগ্র পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৫২৫ কোটি। ১৯৯৯ সালের বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ৬০০ কোটি। ২০০৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৬৮ কোটি। ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে বিশ্বের জনসংখ্যা ৭০০ কোটি ছাড়িয়ে যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এভাবে চলতে থাকলে ২০৪৫ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা হবে ৯০০ কোটি। পৃথিবীর মহাদেশগুলোর মধ্যে এশিয়া মহাদেশে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা বিদ্যমান।

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

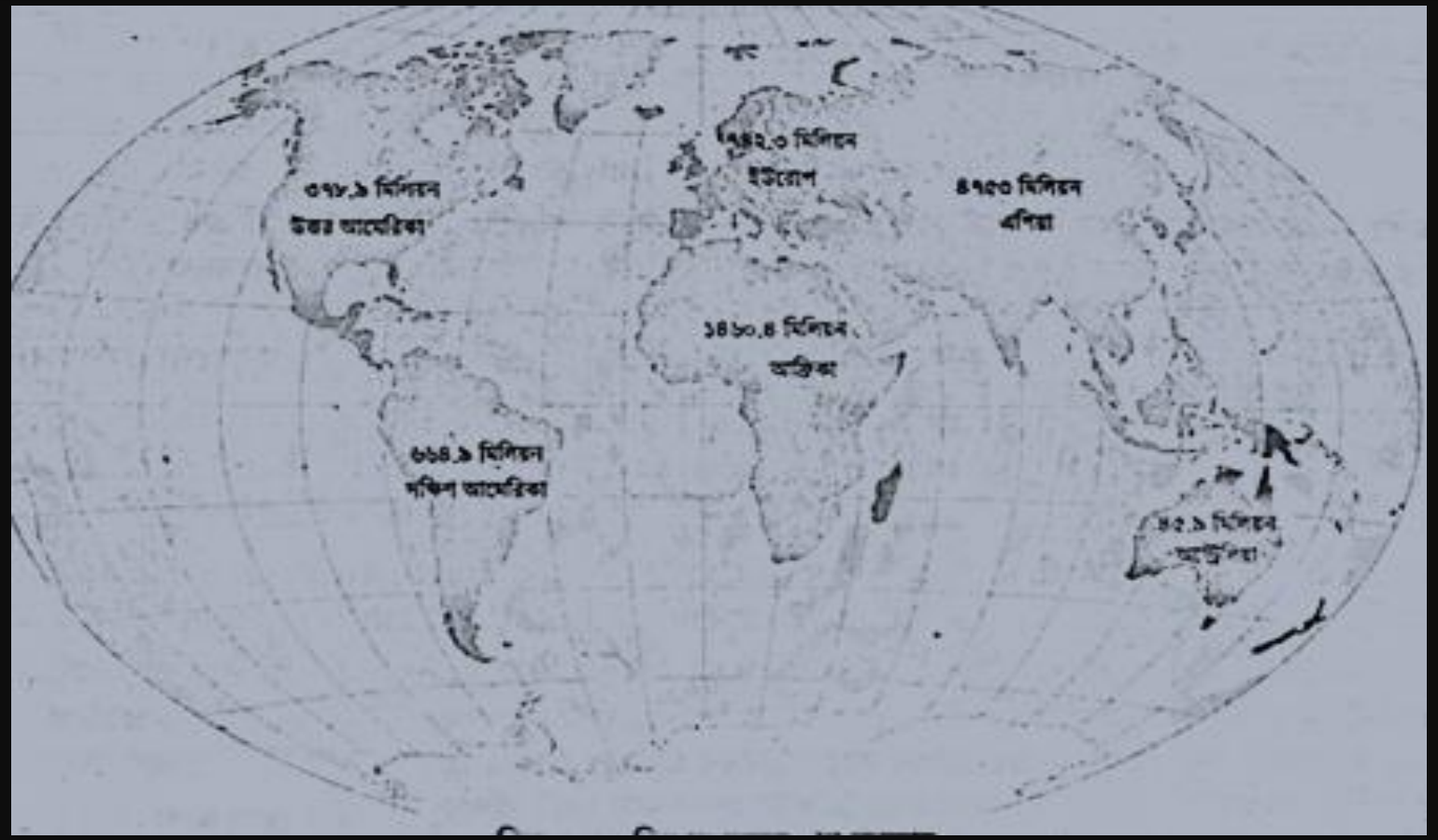

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

সাল	-জনসংখ্যা (বিলিয়ন)
১৮০০	০.৯
১৯০০	১.৬৫
১৯৬০	৩
১৯৮০	৪.৪
২০১৫	৭.৪
২০৪০	(সম্ভাব্য) ৯.২
২১০০	(সম্ভাব্য) ১১.২

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

সারণি-২.২: মহাদেশভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বণ্টন (২০২৩)

মহাদেশ	জনসংখ্যা (২০২১)	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	ঘনত্ব (বর্গ কি.মি.-এ)	বিশ্ব জনসংখ্যার অংশীদার (%)
এশিয়া	৪,৭৫৩,০৭৯,৭২৭	৩১,০৩৩,১৩১	১৫৩	৫৯.১
আফ্রিকা	১,৪৬০,৪৮১,৭৭২	২৯,৬৪৮,৪৮১	৪৯	১৮.২
ইউরোপ	৭৪২,২৭২,৬৫২	২২,১৩৪,৯০০	৩৪	৯.২
দক্ষিণ আমেরিকা	৬৬৪,৯৯৭,১২১	২০,১৩৯,৩৭৮	৩৩	৮.৩
উত্তর আমেরিকা	৩৭৮,৯০৪,৪০৭	১৮,৬৫১,৬৬০	২০	৪.৭
অস্ট্রেলিয়া	৪৫,৫৭৫,৭৬৮	৮,৪৮৬,৪৬০	৫	০.৫

সূত্র: worldometer, July, 2023

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

সারণি-২.৩: পৃথিবীর জনবহুল ১০টি দেশ (২০২১)

ক্রম	দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়নে)	ক্রম	দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়নে)
১	ভারত	১,৪৩০	৬	নাইজেরিয়া	২২৪
২	চীন	১,৪২৬	৭	ব্রাজিল	২১৭
৩	যুক্তরাষ্ট্র	৩৪০	৮	বাংলাদেশ	১৬৯
৪	ইন্দোনেশিয়া	২৭৮	৯	রাশিয়া	১৪৪
৫	পাকিস্তান	২৪১	১০	মেক্সিকো	১২৯

সূত্র: Worldometer, July, 2023

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে জনসংখ্যার আকারগত বৈশিষ্ট্যের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। জনমিতিক প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার আকারগত বৈশিষ্ট্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আকারগত বৈশিষ্ট্য জনসংখ্যার মোট বৃদ্ধির পরিমাণকে প্রভাবিত করে।

২.ঘনত্ব (Density): ঘনত্ব বলতে সাধারণভাবে কোনো বস্তুর উপাদানগত দৃঢ়তা বা সংবদ্ধতা বোঝানো হয়ে থাকে। জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে বিভিন্ন মানুষের সংবদ্ধতা তথা জনবসতির নিবিড়তা বোঝানো হয়ে থাকে। ঘনত্বের দ্বারা ভূমির ওপর জনসংখ্যার চাপের তীব্রতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। গাণিতিকভাবে কোনো দেশের জনসংখ্যাকে ঐ দেশের আয়তন দিয়ে ভাগ করলে জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়।

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

ক্রম	দেশ	আয়তন (বর্গ কিমি)	ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)
১	মেকাও	৩০	১৯,৭৩৭
২	মোনাকো	২.০২	১৯,৩৬১
৩	সিঙ্গাপুর	৭১০	৮,০১৯
৪	বাহরাইন	৭৬৫	২,১৮২
৫	মালদ্বীপ	৩০০	১,৮০২
৬	মাল্টা	৩১৬	১,৬৪২
৭	বাংলাদেশ	১,৪৭,৫৭০	১,১১৯
৮	ভ্যাটিকান সিটি	১	৮০০

সূত্র: World Polulation Review, 2024

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

৩. বয়স কাঠামো (Age Structure); ব্যয়স কাঠামো জনমিতিক উপাদানগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যার বয়স কাঠামো কোনো দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থার প্রকাশ ঘটায়; জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক পরিমাপ করতে হলে জনসংখ্যাকে বিভিন্ন বয়স শ্রেণিতে বিভক্ত করা প্রয়োজন। প্রজনন ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে কোনো জনসংখ্যাকে সাধারণভাবে তিনটি বয়স শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, যথা-

i. শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক: সাধারণত ১৪ অথবা ১৯ বছরের কম বয়স্কদের শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ধরা হয়।

ii. প্রাপ্ত বয়স্ক: ১৫ থেকে ৫৯ কিংবা ১৫ থেকে ৬৪, অথবা ১৯ থেকে ৫৯ কিংবা ১৯ থেকে ৬৪ বছর বয়স্কদের প্রাপ্তবয়স্ক বলা হয়।

iii. বৃদ্ধ: ৬০ বছর ও তদুর্ধ্ব অথবা ৬৫ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়স্কদের বৃদ্ধ বলে ধরা হয়।

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

৪. জনসংখ্যা বিস্তরণ (Distribution): জনমিতি স্থানভেদে জনসংখ্যার অবস্থানগত বিন্যাস পর্যালোচনা করে। এটা জনসংখ্যার বিস্তৃতি জ্ঞাপন করে। এর মাধ্যমে জনসংখ্যার আঞ্চলিক বিভিন্নতার কারণ নির্ণয় ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।

৫. উৎপাদনশীলতা (Productivity); নারীদের সন্তান ধারণ করার ক্ষমতা বা সামর্থ্যকে সমাজবিজ্ঞানী ও জনবিজ্ঞানীগণ Fecundity বা উর্বরতা এবং প্রকৃত সন্তান ধারণ অর্থাৎ সন্তান জন্মদানকে Fertility বা প্রজননশীলতা বলে অভিহিত করে থাকেন। কোনো দেশের উন্নতিতে প্রজননশীলতা বা বংশবৃদ্ধির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রজননশীলতা যেমন কোনো সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে, তেমনি অতি প্রজননশীলতা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। সামাজিক ও জনমিতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রজননশীলতার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

প্রজননশীলতা পরিমাপ করার জন্য জনমিতিতে কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেগুলো হলো:

i. সাধারণ প্রজননশীলতা হার (General Fertility Rate - GFR)
ii. প্রজননশীলতা অনুপাত (Fertility Ratio)
iii. স্থূল প্রজনন হার (Gross Reproduction Rate - GRR)
iv. নীট প্রজনন হার (Net Reproduction Rate - NRR)

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

৬. জন্মহার (Birth Rate): জন্মহার বছরে জনসংখ্যার ভিত্তিতে জন্মিত শিশুর সংখ্যা নির্দেশ করে। এর কয়েকটি পদ্ধতি হলো:

1. স্থূল বা অশোধিত জন্মহার (Crude Birth Rate - CBR)

ii. স্বাভাবিক জন্মহার (Natural or Physiological Birth Rate - NBR)

iii. বয়স নির্দিষ্ট জন্মহার (Age Specific Birth Rate - ASFR)

iv. মোট জন্মহার (Total Birth Rate - TFR)

৭. মৃত্যুহার (Death Rate); জনসংখ্যার আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মৃত্যুহার। মৃত্যুহার জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে সময় ও স্থিতিশীলতা প্রয়োজন, অকাল ও অত্যধিক মৃত্যুর ফলে তা বিঘ্নিত হতে পারে। মৃত্যুহার বিভিন্নভাবে পরিমাণ ও প্রকাশ করা যেতে পারে। নিয়ে মৃত্যুহার পরিমাপের কয়েকটি পদ্ধতি দেওয়া হলো

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

L স্কুল বা অশোধিত মৃত্যুহার (Crude Death Rate - CDR)
ii. বয়স নির্দিষ্ট মৃত্যুহার (Age Specific Death Rate - ASDR)
iii. শিশু মৃত্যুহার (Infant Mortality Rate - IMR)
iv. প্রমিত মৃত্যুহার (Standardified Death Rate - SDR)
V. জন্মকালীন আয়ু প্রত্যাশা (Expectation of Life in Birth)

কোনো দেশের মৃত্যুহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যতম কারণগুলো হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী। এছাড়াও রয়েছে যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, রোগ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি।

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

৮. লিঙ্গ অনুপাত (Sex Ratio): নারী-পুরুষ অনুপাত বা লিঙ্গ অনুপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ জনমিতিক উপাদান। Sex-ratio বলতে প্রতি হাজারে নারী-পুরুষের সংখ্যা অথবা নারীতে পুরুষ সংখ্যাকে বুঝায়। যেমন: তিনটি ভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এই অনুপাত দেখানো যায়।

i. প্রতি ১০০ বা ১০০০ মহিলার মধ্যে পুরুষ সংখ্যা অথবা এর বিপরীত।

ii. মোট জনসংখ্যায় মহিলা বা পুরুষের সংখ্যা।

iii. দশমিক আকারে নারী বা পুরুষের সংখ্যা।

৯. জাতি ও সম্প্রদায় (Ethnicity & Race); জনমিতিতে দেশ, অঞ্চল ও বিশ্বের বিভিন্ন মানব শ্রেণি ও জাতি (যেমন: গারো, খাসিয়া, চাকমা, মারমা, বাঙ্গালী, রোহিঙ্গা, পশতুন, আরব, ইংরেজ, ফরাসী ইত্যাদি। কিংবা ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান, ইহুদী ইত্যাদি) সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়।

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

১০. জনসংখ্যা পরিবর্তন (Population Change): জনসংখ্যার পরিবর্তন বলতে সংখ্যায়ক পরিবর্তনকে বুঝায়। সেটা ধনাত্মক (বৃদ্ধি) বা ঋণাত্মক (হ্রাস) হতে পারে। জনমিতি জনসংখ্যা পরিবর্তন পরিমাপ করে।

১১. জনসংখ্যা স্থানান্তর ও অভিগমন (Movement & Migration): স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য অন্যত্র গমন হল স্থানান্তর আর স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বাস্তুভিটা ত্যাগ করে অন্যত্র আবাস গড়াকে বলে অভিবাসন। জনমিতি স্থানান্তর ও অভিগমনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যাখ্য বিশ্লেষণ করে। জনমিতির অন্যতম উপাদান হলো স্থানান্তর ও অভিগমন।

১২. জনসংখ্যা-সম্পদ অনুপাত (Population-Resource Ratio): জনসংখ্যা ও সম্পদের ভারসাম্য মূল্যায়ন করা হয় জনসংখ্যা ও সম্পদের অনুপাত নির্ণয়ের মাধ্যমে। এটা জনমিতির অন্যতম উপাদান।

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান

১৩. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি (Health & Nutrition): কোনো এলাকার জনগণের সাধারণ স্বাস্থ্য (যেমন: বিভিন্ন রোগে মৃত্যুহার, টিকা গ্রহণ ইত্যাদি) ও পুষ্টিমান (আমিষের অভাব, ভিটামিন ঘাটতি পরিমাণ) পর্যালোচনা করে জনমিতি।

১৪. জনসংখ্যা অভিক্ষেপ (Population Projcetion): জনসংখ্যার অভিক্ষেপ বলতে বোঝায় জনমিতিক পরিবর্তক বা চলকসমূহের বর্তমান গতিপ্রকৃতির ভিত্তিতে জনসংখ্যার ভবিষ্যত পূর্বানুমান। সহজভাবে বলা যায়, জন্মশীলতা ও মরণশীলতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত জনসংখ্যা সম্পর্কিত পূর্বাভাস প্রদান হল জনসংখ্যা অভিক্ষেপ।

১৫. প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী (Disabled Population): শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পরিমাণ নির্ণয় ও এর ধরন ব্যাখ্যা করে জনমিতি।

১৬. শহর-গ্রামীণ সংখ্যার অনুপাত (Urban and Rural Population); শহর ও গ্রামীণ জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনমানের অন্যতম নির্দেশক। জনমিতি এই অনুপাত পরিমাপ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – জনসংখ্যা

টপিক – ০২ অভিগমন

অভিগমন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অভিগমন

অভিগমন (Migration)

অভিগমন এর ইংরেজি শব্দ migration এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'migrate' থেকে, যার অর্থ বাসস্থান পরিবর্তন। আদিকাল থেকেই মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অভিগমন করছে। পৃথিবীর ইতিহাসে তাই অভিগমন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষ তার নিজের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অভিগমন করে। প্রাচীনকালে যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত থাকার কারণে অভিগমনের হার কম ছিল। কিন্তু বর্তমানে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতির ফলে অভিগমনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার এখন বিশ্বে মানুষ দূরবর্তী শহরে ও প্রতিদিন কর্মস্থলে গমন করে; যা অভিগমনের আওতায় পড়ে না।

অভিগমন বলতে মানবগোষ্ঠী এক আবাসস্থল বা জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, সাধারণত দূরে গমনকে বোঝায়। তবে সাধারণ অর্থে migration বলতে তুলনামূলক স্থায়ীভাবে অনেক দূরে গমনকে বোঝানো হয়। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী অভিগমনকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এসব সংজ্ঞায় কিছুটা মতানৈক্য দেখা যায়।

অভিগমন

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী W. Peterson অভিগমনের সংজ্ঞায় বলেন:
"Migration is the permanent or temporal movement of persons over a significant distance".
অভিগমন হলো কোনো ব্যক্তির দূরবর্তী স্থানে স্থায়ী বা সাময়িক গমন বা স্থানান্তর।
কানাডার সমাজবিজ্ঞানী F. S. lee বলেন,
"Migration is the permanent or temporal change of residence."
অভিগমন হলো আবাসস্থলের সাময়িক বা স্থায়ী পরিবর্তন।
United Nations বা জাতিসংঘ এর সংজ্ঞায় বলা হয়-
"Any change of residence for at least one year is called migration."
ন্যূনতম এক বছরের জন্য বাসস্থানের পরিবর্তনই অভিগমন।
জাতিসংঘের মতে, "এক বা একাধিক বছরের জন্য বাসস্থানের যেকোনো রকম পরিবর্তনকে অভিগমন বলে এবং এর চেয়ে স্বল্পকাল স্থায়ী অবস্থানকে অভিগমন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না।"
মি. ক্লার্ক-এর মতে, "বাসস্থান পরিবর্তনের জন্য কোনো রাষ্ট্র বা দেশে আগমন বা দেশান্তর অথবা একই দেশের একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমনকে অভিগমন বলা হয়।"

অভিগমন

উল্লেখ্য মানুষের সব ধরনের স্থান পরিবর্তন, যেমন- দৈনিক কাজের জন্য কর্মস্থলে গমনাগমন, হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়ে গমন প্রভৃতিকে অভিগমনের পর্যায়ভুক্ত করা উচিৎ নয়। কেননা এসব কাজ শেষে সকলেই স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এ ধরনের অভিগমন সাময়িক ও স্বয় দূরত্বে ঘটে থাকে। তবে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে স্বস্থান পরিবর্তন করে' বহুদূরে গিয়ে নতুন আবাস স্থাপন করতে পারে। এরূপ স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে দূরান্তে বা অন্যদেশে গমন করাকে অভিগমন বলে। আলোচনা থেকে আমরা অভিগমনের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি; অর্থাৎ, অভিগমন হবে-

i. বিশেষ উদ্দেশ্যে;
ii. এক সমাজ থেকে অন্য সমাজ ব্যবস্থায়;
iii. উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য;
iv. উল্লেখযোগ্য দূরত্বে;
v. আবাসস্থলের পরিবর্তন।

অতএব, আমরা বলতে পারি, অভিগমন বলতে কোনো ব্যক্তির স্থায়ী গমনকে বোঝায় যেখানে ব্যক্তি একটি সমাজব্যবস্থা থেকে অন্য সমাজব্যবস্থায় গমন করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – জনসংখ্যা

টপিক – ০৩ অভিগমনের কারণ

অভিগমনের কারণ

This Topic is important for

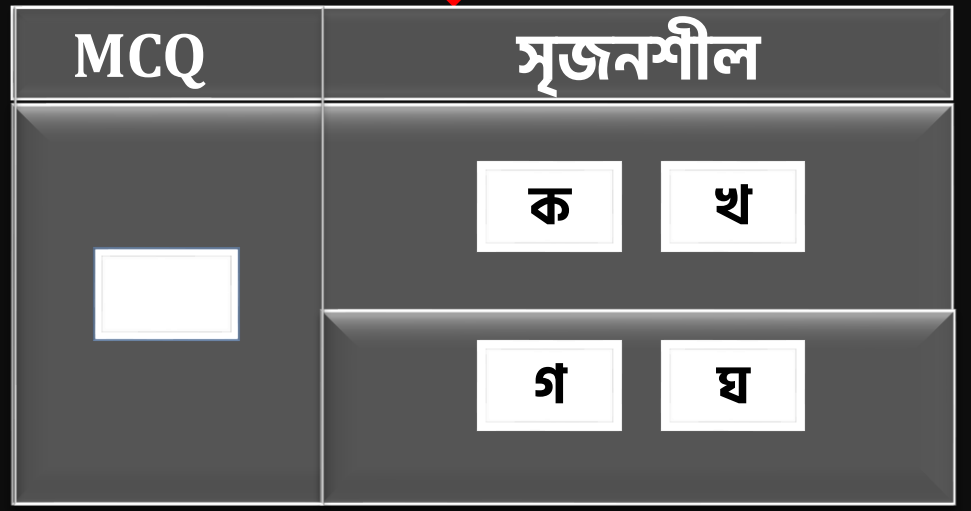

অভিগমনের কারণ

বিভিন্ন কারণে মানুষ অভিগমন করে থাকে। অভিগমনের দুটি প্রধান কারণ হলো- আকর্ষণমূলক (Pull factors) এবং বিকর্ষণমূলক (Push factors)। আকর্ষণমূলক কারণে মানুষ নিজ ইচ্ছায় বাসস্থান ত্যাগ করলেও বিকর্ষণজনিত কারণে মানুষ বাধ্য হয়ে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে। আকর্ষণ ও বিকর্ষণমূলক কারণগুলো হলো-

অভিগমনের আকর্ষণমূলক কারণ: উর্বর কৃষিজমি, খনিজ ও শক্তি সম্পদের ভান্ডার, অনুকূল ও আরামদায়ক জলবায়ু, উচ্চতর শিক্ষা, উন্নততর অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, জীবনযাত্রার উচ্চ মান, অজানাকে জানা, পানির প্রাচুর্য প্রভৃতি।

অভিগমনের বিকর্ষণমূলক কারণ: প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, খরা, মহামারি, অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প, দারিদ্র্যতা, সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক দাঙ্গা, যুদ্ধ, বেকারত্ব।

অভিগমন এর সার্বিক কারণগুলোকে দুইভাবে আলোচনা করা যায়। যথা: (ক) অভ্যন্তরীণ অভিগমন ও (খ) আন্তর্জাতিক অভিগমন।

ক. অভ্যন্তরীণ অভিগমনের কারণ: মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে একই দেশের ভেতর গ্রাম থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে এবং শহর থেকে শহরে অভিগমন করে থাকে। যেসব কারণে এ সকল অভ্যন্তরীণ অভিগমন হয়ে থাকে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

অভিগমনের কারণ

১. অর্থনৈতিক কারণ: মানুষ তার আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন করে। অভ্যন্তরীণ অভিগমনের অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে রয়েছে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ভূমি ও খাদ্য সরবরাহের সীমাবদ্ধতা, শিল্প ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি। যেমন- বাংলাদেশে গ্রাম থেকে মানুষ জেলা শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম) চলে আসে।

২. সামাজিক কারণ: অভ্যন্তরীণ অভিগমনের অন্যতম একটি কারণ হলো সামাজিক অবস্থা। যেমন: বিবাহজনিত কারণে মহিলারা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বা গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন করে থাকে। এছাড়া সন্তান জন্মদানের সময়েও মহিলারা পিত্রালয়ে অভিগমন করে যা অভ্যন্তরীণ অস্থায়ী অভিগমন।

৩. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: কখনো কখনো জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ অভিগমন ঘটে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য মানুষ অনুন্নত গ্রাম হতে উন্নত শহরের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। যেমন- বাংলাদেশের পৌর অঞ্চলে (ঢাকা, গাজীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর) ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. শিল্পের উন্নয়ন: শহরে শিল্পের উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ অভিগমন ঘটে। শিল্পের উন্নতি অভিগমনের একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উপাদান। শহর এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং কৃষিভিত্তিক নয় এমন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন স্থানের মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতা দেখা দেয়।

অভিগমনের কারণ

৫. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন: পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নও অভিগমনের একটি অন্যতম কারণ। প্রাচীনকালে পরিবহনের সুযোগ সুবিধা না থাকায় অভিগমনের হার কম ছিল। বর্তমানে যোগাযোগ সহজ হওয়ার কারণে অভিগমনের হারও বেশি।

৬. ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণ: দেশের অভ্যন্তরে এক শহর থেকে অন্য শহরে মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে অভিগমন করে। যেমন: নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ জেলা শহর থেকে রাজধানী ঢাকায় অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অভিগমন করে থাকে।

৭. ভূমি ও খাদ্যের সীমাবদ্ধতা: ভূমি ও খাদ্যের সীমাবদ্ধতা অভ্যন্তরীণ অভিগমনের আরেকটি কারণ। ভূমির সীমাবদ্ধতা মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এক্ষেত্রে জমির অনুপাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মাথাপিছু আয় কমে যায়। ফলে মানুষ অভিগমন করতে চায়।

৮. জনসংখ্যার চাপ: পারিবারিক জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেলে মানুষ এক স্থান হতে অন্য স্থানে অভিগমন করে। অভ্যন্তরীণ অভিগমনের অন্যতম একটি কারণ হলো জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি।

৯. কৃষিব্যবস্থা যান্ত্রিকীকরণ: যে অঞ্চলে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় সে অঞ্চলে কৃষকরা সহজেই অভিগমন করে। গ্রাম থেকে গ্রামে বা শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে এ ধরনের অভ্যন্তরীণ অভিগমন দেখা যায়।

অভিগমনের কারণ

খ. আন্তর্জাতিক অভিগমনের কারণ: মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যে অভিগমন করে তাকে আন্তর্জাতিক অভিগমন বলে। আন্তর্জাতিক অভিগমন যেসব কারণে হয় সেগুলো আলোচনা করা হলো:

১. অর্থনৈতিক কারণ: সাধারণত মানুষ উন্নত ও সচ্ছল জীবনযাপনের জন্য এক
জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অধিক হারে অভিগমন করে। সাধারণত কৃষি জমির হ্রাস, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, শিল্পায়ন, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এসব কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অভিগমন ঘটে থাকে। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের মানুষ বিদেশে ভালো কাজের আশায় মধ্যপ্রাচ্যে (কাতার, বাহরাইন) অভিগমন করে থাকে।

অভিগমনের কারণ

২. সামাজিক কারণ: অভিগমনের জন্য কিছু সামাজিক কারণও থাকতে পারে, যেমন: আত্মীয়-স্বজন, ভাষা, বৈবাহিক সম্পর্ক, জোরপূর্বক উৎখাত, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন। যেমন- মিয়ানমার থেকে রোহিংগাদের বাংলাদেশে আসা ইত্যাদি কারণে আন্তর্জাতিক অভিগমন ঘটে।

৩. রাজনৈতিক কারণ: বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে আন্তর্জাতিক অভিগমন হয়ে থাকে। সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা, আইন-কানুন, রাজনৈতিক অসন্তোষ ইত্যাদি কারণে অভিগমন হয়ে থাকে। যেমন- বাংলাদেশ থেকে কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন।

৪. সাংস্কৃতিক কারণ: অনেক ক্ষেত্রে অভিগমনের পেছনে কিছু সাংস্কৃতিক কারণ থাকে। মানুষ উন্নত ও মুক্ত সমাজব্যবস্থার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। শিক্ষা, খাদ্যাভাব, ভাষা, উন্নত মন-মানসিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন দেশে অভিগমন করে থাকে। যেমন- বাংলাদেশের অনেকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

অভিগমনের কারণ

৫. ধর্মীয় কারণ: ধর্মীয় কারণেও কিছু মানুষ অভিগমন করে থাকে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে হিন্দু অধ্যুষিত দেশে ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে মুসলমান অধ্যুষিত দেশে অভিগমনের প্রবণতা থাকে। যেমন: সামর্থ্যবান হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই বাংলাদেশ থেকে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেন।

৬. শিক্ষা ও গবেষণা: উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার কাজেও অভিগমন হয়ে থাকে। মানুষ অনুন্নত, উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য উন্নত দেশগুলোতে অভিগমন করে। যেমন- বাংলাদেশ থেকে শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য যুক্তরাজ্য, কানাডায় গমন করে।

৭. জলবায়ু পরিবর্তন: বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন এবং সেই সাথে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধিও অভিগমনের কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – জনসংখ্যা

টপিক – ০৪ অভিগমনের ধরন

অভিগমনের ধরন

This Topic is important for

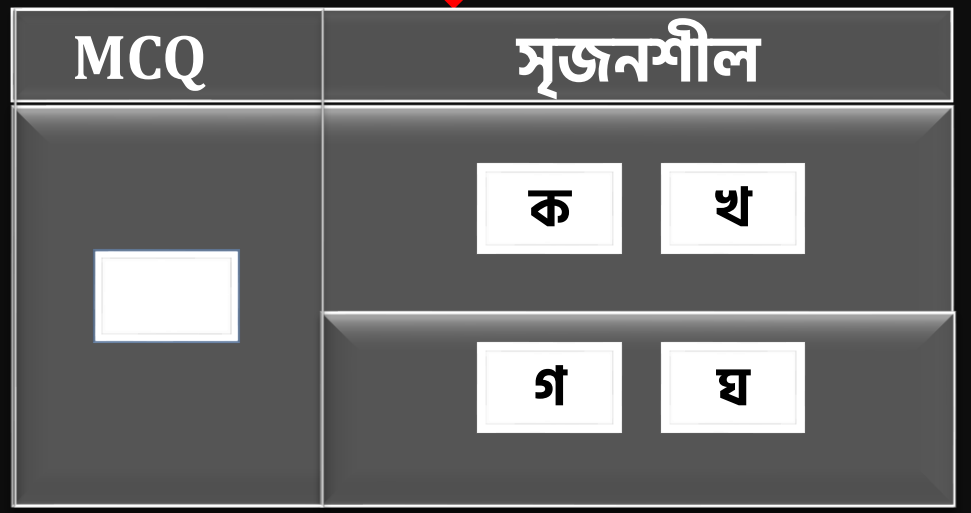

অভিগমনের ধরন

বিভিন্ন জনবিজ্ঞানী ও সংস্থা বিভিন্ন দেশের পরিপ্রেক্ষিতে অভিগমনকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিভাগ করেছেন। যেমন-

William Peterson তার লেখা 'A General Typology of Migration in American Sociological Review' (১৯৫৮) নামক গ্রন্থে অভিগমনকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. আদিম অভিগমন (Primitive Migration)

২. বাধ্যতামূলক অভিগমন (Force Migration)

৩. প্ররোচনামূলক অভিগমন (Impelled Migration)

৪. স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অভিগমন (Free Migration)

৫. গণ অভিগমন (Mass Migration)

সাধারণত প্রকৃতি অনুসারে দুই ধরনের অভিগমন দেখা যায়। যথা- ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক।

১. ঐচ্ছিক অভিগমন: যখন মানুষ তার নিজের চাহিদা মেটানোর জন্য বা নিজের ইচ্ছায় অভিগমন করে তখন তাকে বলা হয় ঐচ্ছিক অভিগমন। যেমন- উচ্চশিক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্রে অভিগমন।

২. অনৈচ্ছিক অভিগমন: মানুষ যখন ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতির কারণে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় তখন তাকে অনৈচ্ছিক অভিগমন বলে। যেমন- মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অভিগমন।

অভিগমনের ধরন

স্থানের ওপর ভিত্তি করে অভিগমনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা- ১. অভ্যন্তরীণ; ও ২. আন্তর্জাতিক।

১. অভ্যন্তরীণ অভিগমন: যখন মানুষ নিজ দেশের মধ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অভিগমন করে তাকে অভ্যন্তরীণ অভিগমন বলে। এ অভিগমনের ক্ষেত্রে দেশের সীমা অতিক্রম করতে হয় না। যেমন: এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় অভিগমন। অভ্যন্তরীণ অভিগমনকে আবার দুইভাবে দেখা যায়। যথা-ক. ধারা (stream) অনুযায়ী অভিগমন; ও খ. দূরত্ব অনুযায়ী অভিগমন।

অভিগমনের ধরন

ক. ধারা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ অভিগমন; এই ধরনের অভিগমনের প্রধান ধারাগুলো হলো:

i. গ্রাম থেকে গ্রামে: যখন কোনো মানুষ একই দেশে একটি গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে অভিগমন করে তখন তাকে বলা হয় গ্রাম থেকে গ্রামে অভিগমন। পুরুষদের তুলনায় মহিলারা এ ধরনের অভিগমন অধিক পছন্দ করে। কারণ তারা অধিক দূরত্বে অভিগমনে অনিচ্ছুক থাকে।

ii. গ্রাম থেকে শহরে; একই দেশের মধ্যে গ্রাম থেকে শহর এলাকায় অভিগমনকে বলা হয় গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন। এটি অভ্যন্তরীণ অভিগমনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরন। সাধারণত যেসব দেশে কেবল শিল্পায়ন, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হয়েছে সেসব দেশে মানুষ অধিক উপার্জনের আশায় গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন করে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ ধরনের অভিগমনের ধারা লক্ষ করা যায়। যেমন- বাংলাদেশ।

iii. শহর থেকে গ্রামে; যখন কোনো মানুষ একই দেশের মধ্যে শহর থেকে গ্রামে অভিগমন করে তখন সেই ধারাকে বলা হয় শহর থেকে গ্রামে অভিগমন। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর অনেকে এ ধরনের অভিগমন করেন। উন্নত দেশে এরূপ দেখা যায়।

অভিগমনের ধরন

iv. শহর থেকে শহরে: একই দেশের মধ্যে এক শহর থেকে অন্য শহরে অভিগমন হয়ে থাকে। সাধারণত ভালো চাকরি, ব্যবসা, আত্মীয়-স্বজন, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি কারণে মানুষ এক শহর থেকে অন্য শহরে অভিগমন করে থাকে। যেমন- ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় আগমন।

খ. দূরত্ব অনুযায়ী অভিগমন: দূরত্বের ভিত্তিতে সাধারণত তিন ধরনের অভ্যন্তরীণ অভিগমন দেখা যায়। যেমনঃ

i. স্বল্প দূরত্বে অভিগমন: এক থানা থেকে অন্য থানায় অভিগমন।

ii. মাঝারি দূরত্বে অভিগমন: এক জেলা থেকে অন্য জেলায় অভিগমন।

iii. অধিক দূরত্বে অভিগমন: এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে অভিগমন।

অভিগমনের ধরন

২. আন্তর্জাতিক অভিগমন: যখন মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য (কমপক্ষে ৬ মাসের জন্য) অভিগমন করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক অভিগমন বলা হয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো দেশের রাজনৈতিক সীমা অতিক্রম করতে হয়। জনমিতিতে আন্তর্জাতিক অভিগমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এই অভিগমনের ফলে দেশের জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। কোনো দেশের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অভিগমনের প্রকৃতি দুই ধরনের হতে পারে। যথা- i. বহিরাগমন (Immigration) ও ii. বহির্গমন (Emigration)। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে বহিরাগমন হবে অন্য দেশ থেকে বাংলাদেশে আসা। যেমন ভারত ও চীনের বেশ কিছু ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসার প্রসারে এদেশে বসবাস করেন। আবার বহির্গমন হবে আমাদের দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাওয়া। যেমন- বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার জন্য, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বসবাস করে।

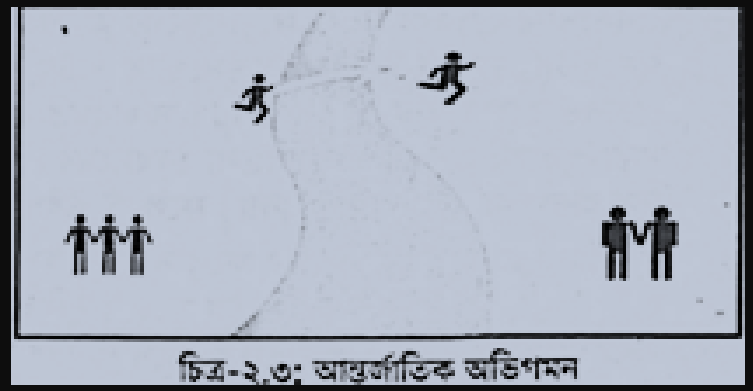

চিত্র-২.৩: আন্তর্জাতিক অভিগমন

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – জনসংখ্যা

টপিক – ০৫ অভিগমনের প্রভাব

অভিগমনের প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অভিগমনের প্রভাব

অভিগমনের যেমন কিছু ভালো দিক রয়েছে তেমনি মন্দ দিকও রয়েছে। অভিগমনের প্রভাবগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

১. অর্থনৈতিক প্রভাব: অভিগমনের ফলে অর্থনীতির ওপর বিশেষ প্রভাব পড়ে। আন্তর্জাতিকভাবে অভিগমনকারীগণ নিজ দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে এবং পরিবারে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়। গ্রামের গরিব মানুষ শহরে এসে নতুন পেশায় অধিক আয় করে থাকে।

২. জনসংখ্যার ওপর প্রভাব: কোনো দেশের জনসংখ্যার জন্য অভিগমনের ভালো দিকগুলো হলো দেশের জনসংখ্যার পুনঃবণ্টন, সম্পদ অনুযায়ী জনসংখ্যার বণ্টন, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি। এছাড়াও অভিগমনের কিছু ঋণাত্মক প্রভাবও রয়েছে জনসংখ্যার ওপর। সাধারণত নারীদের তুলনায় পুরুষরা অভিগমনে অধিক আগ্রহী থাকে। ফলে নারী-পুরুষের অনুপাতে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। এছাড়াও গ্রাম থেকে পুরুষরা শহরে অধিক অভিগমন করায় গ্রামে দক্ষ জনশক্তির অভাব দেখা দেয়। ফলে তা উৎপাদনমূলক কাজের (যেমন- কৃষি) ক্ষতিসাধন করে।

অভিগমনের প্রভাব

৩. সামাজিক প্রভাব: অভিগমনের ফলে সমাজব্যবস্থায় কিছু ইতিবাচক প্রভাব দেখা দেয়। যেমন- পরিবার নিয়ন্ত্রণ, নারী শিক্ষা, নতুন প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। এছাড়াও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত হয় এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির ও মানুষের সাথে পরিচয় ঘটে।
সামাজিকভাবে অভিগমনের কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। যেমন- পরস্পরের মধ্যকার বন্ধন কমে যায়, হতাশা বৃদ্ধি পায়। অভিগমন গ্রামের মহিলাদের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। স্বামী অন্যত্র অভিগমন করলে তাদের শারীরিক ও মানসিক চাপের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

৪. পরিবেশগত প্রভাব: পরিবেশের ওপর অভিগমনের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। শহরাঞ্চলে অধিক অভিগমনের ফলে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিক জনসংখ্যার ফলে শহরে অপরিকল্পিতভাবে বাসস্থান ও স্থাপনা তৈরি হয় এবং বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হয়। ফলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অধিক চাপ পড়ে; ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যায়, বায়ু, পানি ও মৃত্তিকাদূষণ ঘটে। এভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

অভিগমনের প্রভাব

৫. জৈবিক পরিবর্তন: অভিগমনের ফলে মানুষ তার জন্মস্থান ত্যাগ করে কোনো নতুন জায়গায় আসে। ফলে জৈবিক পরিবর্তন ঘটে। নতুন পরিবেশে এসে অনেকেরই স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। শহরের ঘনবসতি; বায়ু দূষণ এবং অপর্যাপ্ত বাসস্থান গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষদের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায়।

৬. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন: এক স্থান থেকে অন্যস্থানে অভিগমনের ফলে মানুষের গুণগত ও সংস্কৃতির কিছু পরিবর্তন ঘটে। যেমন- ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – জনসংখ্যা

টপিক – ০৬ জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য: জন্মহার, মৃত্যুহার, বৃদ্ধিহার, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অভিগমন

জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য: জন্মহার, মৃত্যুহার, বৃদ্ধিহার, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অভিগমন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য: জন্মহার, মৃত্যুহার, বৃদ্ধিহার, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অভিগমন

বাংলাদেশ পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৫০.৮৪ মিলিয়ন ২০০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২৪.৩৫ মিলিয়ন এবং ২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬৯.৮২ মিলিয়ন। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনও বেশি (১.১২%)। বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় সকল জেলাতেই সমান শুধু তিনটি পার্বত্য জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে কম। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

জনসংখ্যার পরিমাণ: পৃথিবীর প্রথম ১০টি জনবহুল দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯১.০৮% মুসলিম, ৭.৯৬% হিন্দু, ০.৬১% বৌদ্ধ, ০.৩% খ্রিস্টান ও অন্যান্য ০.০৬%। (সূত্র: জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২)। বিশ্বে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান জনসংখ্যায় দ্বিতীয়।

জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য: জন্মহার, মৃত্যুহার, বৃদ্ধিহার, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অভিগমন

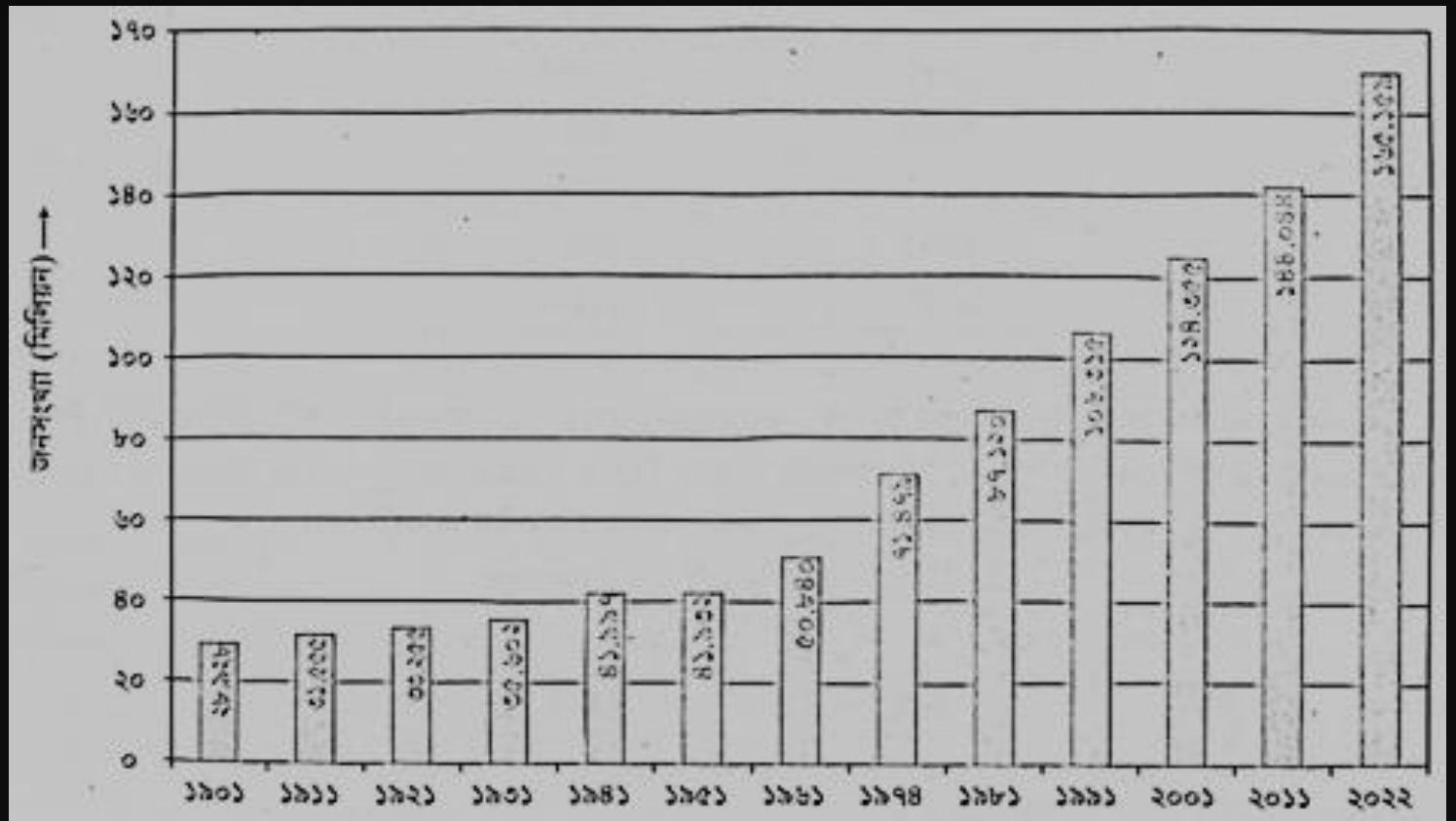

চিত্র-২.৫: বাংলাদেশের জনসংখ্যার গ্রাফচিত্র (১৯০১-২০২২)

সূত্র- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বাংলাদেশ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী)

জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য: জন্মহার, মৃত্যুহার, বৃদ্ধিহার, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অভিগমন

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি ছিল। ১৯৭৪ সাল হতে ১৯৯১ সালের মধ্যে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৮৪% থেকে কমে ২.০১% হয়েছে। এ ধারা বজায় রেখে ২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী দেখা যায়, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.১২%, যা ২০১১ সালে ছিল ১.৩৭%। অতএব বলা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে।

সাল	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৮১	২.৮৪
১৯৯১	২.০১
২০০১	১.৫৮
২০১১	১.৪৬
২০২২	১.১২

জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য: জন্মহার, মৃত্যুহার, বৃদ্ধিহার, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অভিগমন

জনসংখ্যার ঘনত্ব: বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি. মি.। ২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১১১৯ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯.৭৪ সালের গণনা অনুসারে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৪৮৪ জন। বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ বিভাগ ঢাকা। বর্তমানে এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২১৫৬ জন এবং জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে।

সাল	ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি. মি.)
১৯৭৪	৪৮৪
১৯৮১	৫৯০
১৯৯১	৭২০
২০০১	৮৪৩
২০২২	১১১৯

জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য: জন্মহার, মৃত্যুহার, বৃদ্ধিহার, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অভিগমন

জন্ম ও মৃত্যুহার: বর্তমানে বাংলাদেশে জন্মহার আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তার কারণ হলো পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ, চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি। একই সাথে শিশু মৃত্যুহারও আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তবে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশি।

সাল	স্থূল জন্মহার	স্থূল মৃত্যুহার	শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)
২০০১	১৮.৯	৪.৮	৫৬
২০১১	১৯.২	৫.৫	৩৫
২০২১	১৮.৮	৫.৭	২২

জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য: জন্মহার, মৃত্যুহার, বৃদ্ধিহার, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অভিগমন

নারী-পুরুষের অনুপাত (Sex Ratio)

বাংলাদেশে ২০০৪ সাল পর্যন্ত নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি ছিল। বর্তমান নারী পুরুষের অনুপাতে সামঞ্জস্য এসেছে। বাল্যবিবাহ, সন্তান প্রসবকালীন মৃত্যু, অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ, যথাযথ চিকিৎসা ও পুষ্টির অভাব প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশে নারীর মৃত্যুহার বেশি। তবে বর্তমানে এসব ব্যবস্থার উন্নতির ফলে নারী মৃত্যুহার অনেকাংশে কমেছে

সাল	পুরুষ	মহিলা
১৯৯১	১০৬.২৬	১০০
২০০৪	১০৪.১	১০০
২০১১	১০০,৩	১০০
২০২২	১০০.২	১০০

জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য: জন্মহার, মৃত্যুহার, বৃদ্ধিহার, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অভিগমন

অভিগমন

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য অভিগমন। এদেশে গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন ব্যাপক, বিস্তৃত এবং দ্রুত। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামে বসবাস করে। বাংলাদেশে ৮টি বিভাগীয় শহর রয়েছে এবং নগরায়ণের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অত্যধিক পরিমাণ জনসংখ্যা বসবাস করে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৩১.৬৬ শতাংশ নগরে বাস করে এবং নগরায়ণের হার ৩.৫% (সূত্র- Woldometer, July, 2023)। এছাড়া গ্রাম থেকে গ্রামে বিবাহজনিত কারণে কেবল নারীদের অভিগমন উল্লেখযোগ্য।

অপরদিকে আন্তর্জাতিক অভিগমনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বহিঃগমনকারীর সংখ্যা আগমনকারীর তুলনায় অনেক বেশি (মায়ানমার থেকে বলপূর্বক রোহিঙ্গা আগমন বিবেচনা না করে)। যে কারণে নিট অভিগমন হারে বাংলাদেশের মান ঋণায়ক। কিন্তু বাংলাদেশে বহিঃগমনের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য: জন্মহার, মৃত্যুহার, বৃদ্ধিহার, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অভিগমন

বাংলাদেশের জনসংখ্যার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা হলো-

i. নৃগোষ্ঠী: বাংলাদেশের অধিক সংখ্যক লোক (প্রায় ৯৯%) বাঙালি। এছাড়া কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ১% রয়েছে যেমন: খাসিয়া, সাঁওতাল, চাকমা, মারমা, গারো, বিহারী এবং মুন্ডা। বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ বিশেষত চাকমা জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে। এরা চট্টগ্রাম বিভাগের মোট জনসংখ্যার ২.৯৯%। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

ii. ভাষাগত বৈশিষ্ট্য: বাংলাদেশের মানুষের প্রধান ভাষা বাংলা। এটি জাতীয় ভাষা (৯৫% জনগণ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালীতে কিছু উপভাষা রয়েছে। আদিবাসীদের কিছু নিজস্ব ভাষা রয়েছে যেমন: খাসিয়া, জৈয়ন্তিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, মণিপুরী, আরাকানীয়, চাকমা, গারো, হো, এবং কুরুখ।

iii. ধর্মভিত্তিক বৈশিষ্ট্য: ২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী বাংলাদেশে ৯১.০৮% লোক মুসলমান, ৭.৯৬% লোক হিন্দু, ০.৬১% লোক বৌন্দ, ০.৩% খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ০.০৬%। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ সুন্নী (প্রায় ৯৫%) এবং অন্য মুসলমানরা শিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য: জন্মহার, মৃত্যুহার, বৃদ্ধিহার, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অভিগমন

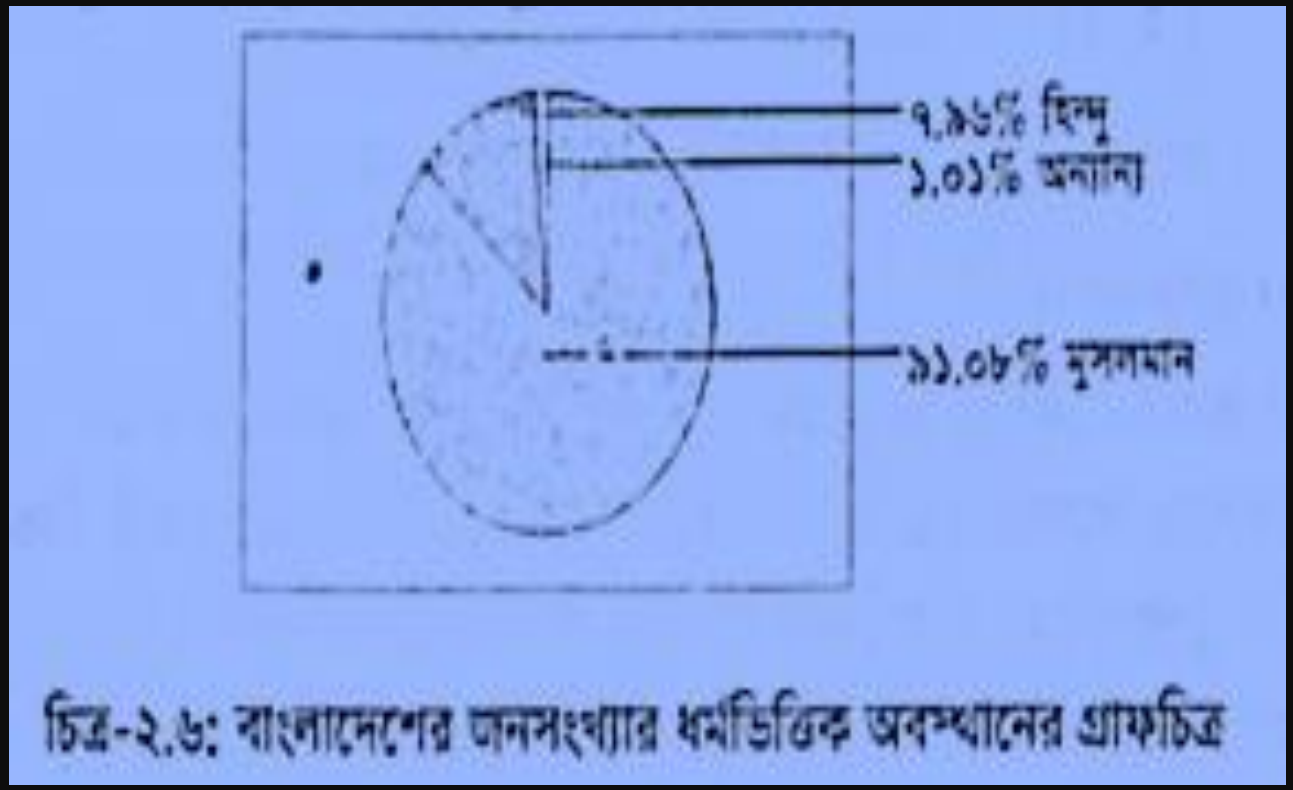

চিত্র-২.৬: বাংলাদেশের জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক অবস্থানের গ্রাফচিত্র

জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য: জন্মহার, মৃত্যুহার, বৃদ্ধিহার, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অভিগমন

iv. শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য: উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার তুলনামূলকভাবে কম। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার ৭৪.৬৬% (সূত্র: জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২)। পূর্বের তুলনায় বাংলাদেশে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নারী শিক্ষার হারও আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকায় দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

সাল	মোট	মহিলা	পুরুষ
১৯৯১	২৪.৯০	১৯.৫০	৩০.০০
২০০৪	৩৮.০৬	৩৫.৩১	৪০.৭০
২০১১	৫১.৭৭	৪৯.৪৪	৫৪.১১
২০২২	৭৪.৬৬	৭২.৮২	৭৬.৫৬

জনসংখ্যার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য: জন্মহার, মৃত্যুহার, বৃদ্ধিহার, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অভিগমন

v.পেশাগত বৈশিষ্ট্য: বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষি ও কৃষিভিত্তিক পেশার সঙ্গে জড়িত। কৃষিতে ৪৮.৪%, শিল্পে ২৪.৩% এবং অন্যান্য সেবা খাতে ২৭.৩% লোক জড়িত (সূত্র: জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০২৩)। ২০১১ সালের সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ৩৭.৮% লোক কর্মক্ষম বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। মোট ৫.৪১ কোটি শ্রমিকের মধ্যে পুরুষ ৩.৭৯ কোটি ও নারী ১.৬২ কোটি (সূত্র: বিইএস)।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – জনসংখ্যা

টপিক – ০৭ জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল

This Topic is important for

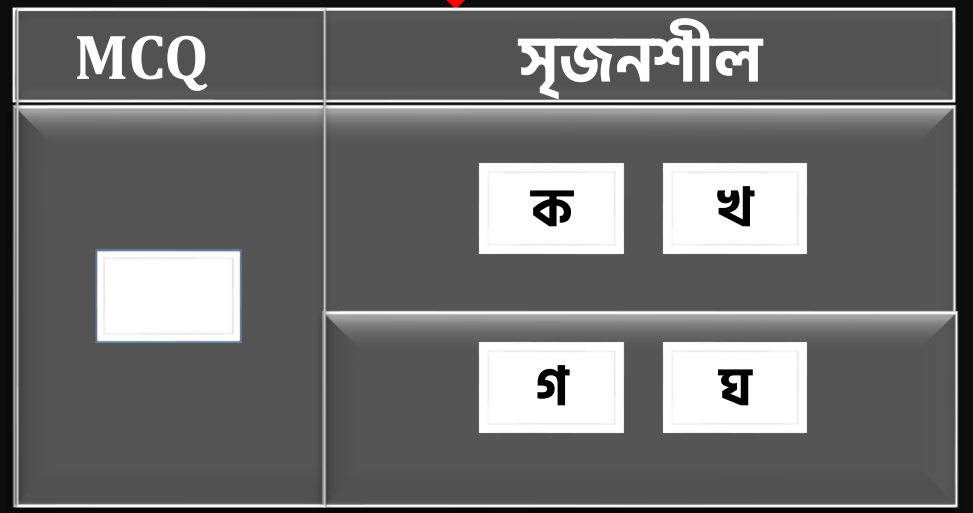

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল হলো এমন একটি মডেল, যা সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যার পরিবর্তন বর্ণনা করে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে কোনো অঞ্চল বা দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহার পরিবর্তিত হয়। ফলে ঐ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থির থাকে। এর ফলে জনসংখ্যা এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে পরিবর্তিত হতে থাকে। জনসংখ্যার এই ধরনের ট্রানজিশনই জনমিতিক ট্রানজিশন নামে পরিচিত। জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাখ্যায় আধুনিক মডেল হিসেবে পরিচিত।

উৎপত্তি: বিখ্যাত আমেরিকান ভূগোলবিদ ওয়ারেন থমসন (Waren Thompson) ১৯২৯ সালে প্রথম জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেলের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই মডেলের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে Waren Thompson শিল্পায়িত আধুনিক সমাজের গত দু'শ বছরের জন্মহার, মৃত্যুহার এবং ট্রানজিশন পর্যালোচনা করেন।

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল

মূল বিষয়বস্তু

পৃথিবীর উন্নত, স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল, অনুন্নত দেশগুলির জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অনুন্নত থেকে উন্নত দেশ হিসেবে উপনীত হওয়া পর্যন্ত, ধাপগুলির বৈশিষ্ট্য একই রকম। আর ধাপগুলির এ পর্যালোচনাই ট্রানজিপশনাল মডেলের মূল প্রতিপাদ্য।

এ মডেল জন্মহার ও মৃত্যুহারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা হয়েছে। এ মডেল অনুসারে-প্রথমে কোনো দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশি থাকে। ধীরে ধীরে জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহার কমতে শুরু করে। এর পরে ধীরে ধীরে জন্মহারও কমতে শুরু করে। জন্মহার ও মৃত্যুহার হ্রাস পায় অত্যন্ত ধীর গতিতে এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান থাকায় এই সময়ে কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেলকে Thompson চারটি ধাপে আলোচনা করেন। ধাপ চারটি হলো;

১. উচ্চ জন্মহার এবং উচ্চ মৃত্যুহার।

২. অধিক জন্মহার এবং মৃত্যুহার হ্রাস।

৩. মৃত্যুহার ও জন্মহার উভয়ই হ্রাস।

৪. মৃত্যুহারের তুলনায় কম জন্মহার।

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল

প্রথম ধাপ

এটি হলো ট্রানজিশনের পূর্বের সময়। অনুন্নত দেশসমূহ যেখানে শিল্পায়ন হয়নি, জীবনযাত্রার নিম্নমান বিদ্যমান, কৃষি নির্ভরশীল অর্থনীতি, শিক্ষার হার কম সেই সমস্ত দেশই এই ধাপের অন্তর্গত। যেহেতু এই সকল দেশের অর্থনীতি অনুন্নত সেহেতু অধিক জন্মহার ও মৃত্যুহার থাকে।

বার্মা (মায়ানমার), ভুটান, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্য আমেরিকা ইত্যাদি দেশসমূহ এই পর্যায়ে পড়ে। এই পর্যায়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে অধিক জন্মহার, অধিক মৃত্যুহার, অধিক শিশু মৃত্যুহার, জীবনযাত্রার নিম্নমান, অনুন্নত অর্থনীতি, শিক্ষার অভাব, খাদ্যের অভাব, চিকিৎসার অভাব ইত্যাদি।

এই ধাপে অধিক জন্মহার থাকার মূল কারণগুলো হলো বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বড় পরিবার, শিক্ষার অভাব, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় গোঁড়ামি, কৃষিতে নির্ভরশীলতা ইত্যাদি। এছাড়া অধিক মৃত্যুহার থাকার কারণ হলো খাদ্য ও চিকিৎসার অভাব, যুদ্ধ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি।

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল

দ্বিতীয় ধাপ

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেলের এই ধাপকে শিল্পধাপ বলা যায়, যা শুরু হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে। এই ধাপে শিল্পবিপ্লব মূলত কৃষিবিপ্লবের সঙ্গে শুরু হয়। এই সময়ে এসে মৃত্যুহার হ্রাস পায়, কিন্তু জন্মহার অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশে এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেলের এই ধাপের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো অধিক জন্মহার ও নিম্ন মৃত্যুহার। নগরায়ণ, কৃষির উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, পানির সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি ইত্যাদি। ফলে ধীরে ধীরে মৃত্যুহার কমতে থাকে। কিন্তু জন্মহারের ক্ষেত্রে ১ম ধাপের ন্যায় অবস্থা বিরাজ করার কারণে জন্মহার অপরিবর্তিত থাকে। এর ফলে ২য় ধাপে এসে কোনো দেশে অধিক জনসংখ্যা যোগ হয়। এই ধাপকে আরো কিছু উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছে।

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল

প্রাক ট্রানজিশন: এই পর্যায়ে মৃত্যুহার কমতে শুরু করে কিন্তু মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতির কারণে জন্মহার কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

মধ্য ট্রানজিশন: জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই কমতে শুরু করে, কিন্তু জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় বেশিই থাকে।

ট্রানজিশন পরবর্তী সময়: জন্মহার ও মৃত্যুহার কমার ধারা অব্যাহত থাকে, কিন্তু এই সময়েও জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় অধিক থাকে।

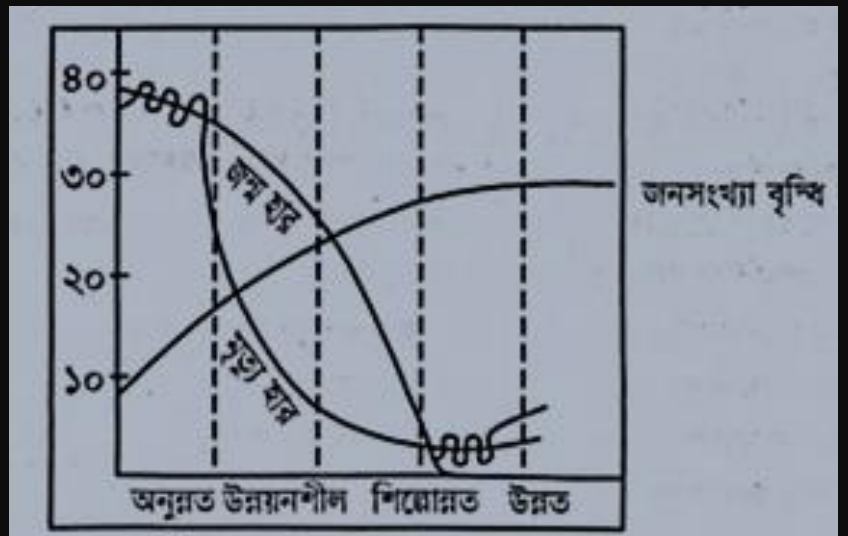

চিত্র-২.৭: জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল ও উন্নয়নের ধারা

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল

তৃতীয় ধাপ

এই পর্যায় বা ধাপকে বলা হয় অর্থনৈতিকভাবে উন্নত পর্যায়। এই ধাপে এসে জন্মহার কমতে শুরু করে এবং মৃত্যুহারের সমান হয় এবং জনসংখ্যার ভারসাম্য বজায় থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে উন্নত দেশগুলোতে এই অবস্থা বিরাজমান ছিল। ইউরোপের দেশগুলো, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এই ধাপের অন্তর্গত।

এই সময় কতগুলো বিশেষ কারণে জন্মহার হ্রাস পেতে থাকে, যেমন: গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, নির্ভরশীলতা হ্রাস, অধিক নগরায়ণ ও ছোট পরিবার, নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নতি, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং এই সব কিছুর সাথে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি।

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল

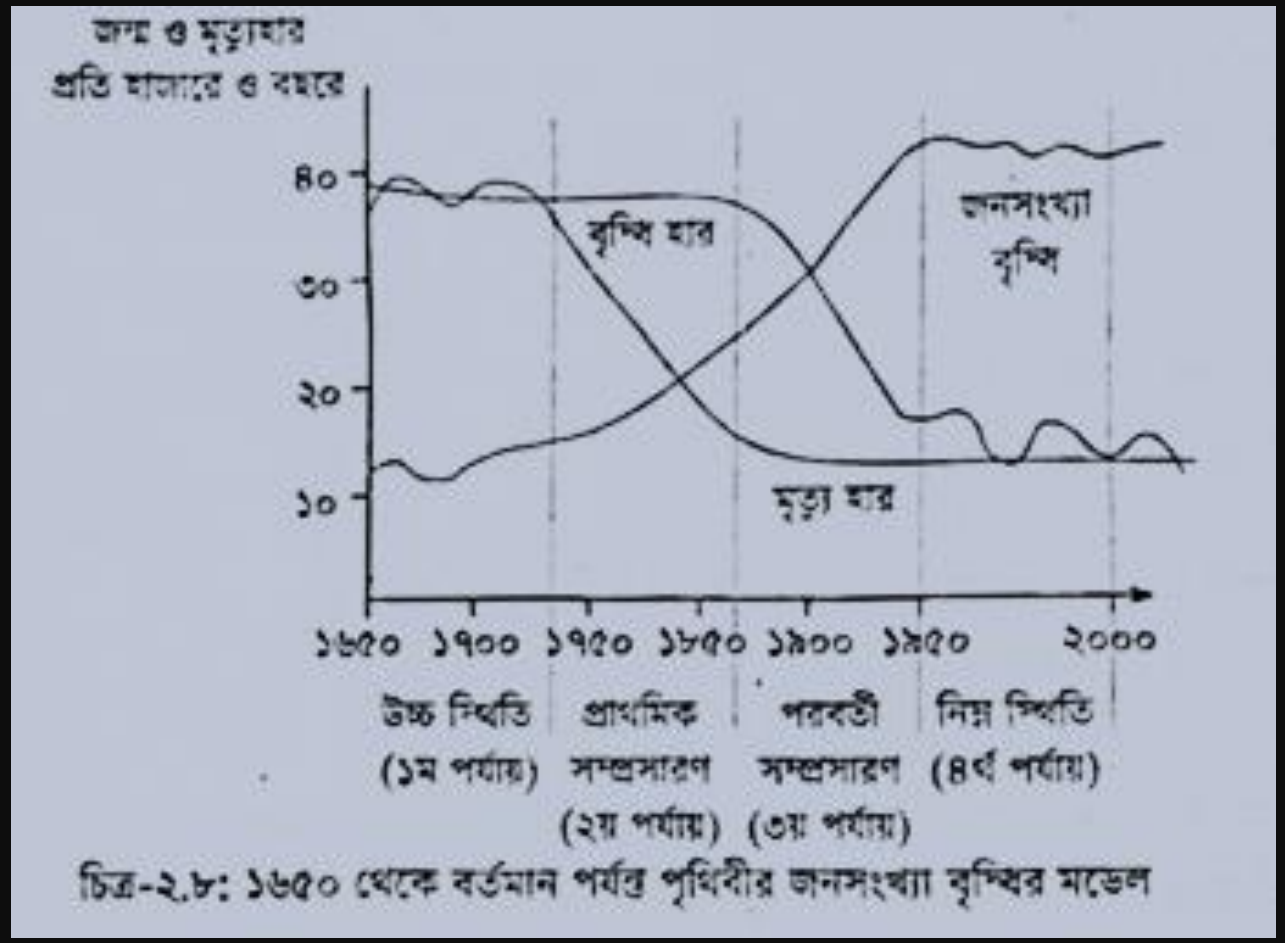

চিত্র-২.৮: ১৬৫০ থেকে বর্তমান পর্যন্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির মডেল

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল

চতুর্থ ধাপ

জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের ৪র্থ পর্যায়ে জনসংখ্যার পরিবর্তন (জন্মহার, মৃত্যুহার) স্থিতিশীল থাকে। জন্মহার ধীরে ধীরে এমনভাবে কমতে শুরু করে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শূন্যতে পৌঁছায়। একই সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ও জীবনমান উন্নত হওয়ায় মৃত্যুহারও কমতে শুরু করে। এর ফলে দেশে জনসংখ্যা স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে ও নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

নিউজিল্যান্ড, সুইডেনের মতো উন্নত দেশগুলোতে এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষিতে মডেলটির পর্যায়গুলো বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়

ধাপ	স্তর	জন্ম ও মৃত্যু হারের তুলনা	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
১ম	উচ্চ স্থিতিশীল	জন্ম ও মৃত্যুর উচ্চ	কম
২য়	প্রাথমিক সম্প্রসারণশীল	উচ্চ জন্মহার, মৃত্যুহার হ্রাস	বেশি
৩য়	পরবর্তী সম্প্রসারণশীল	জন্ম ও মৃত্যু হার হ্রাস	ধীর
৪র্থ	নিম্ন স্থিতিশীল	মৃত্যুহারের তুলনায় জন্মহার হ্রাস	স্থির

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল

সমালোচনা: এ তত্ত্বটি অধিক যুক্তিযুক্ত ও বাস্তব বলে প্রমাণিত হলেও কতগুলো বিষয় অনিশ্চিত। এ তত্ত্বটি তাই নানাভাবে সমালোচিত। যেমন-

১. ঐতিহাসিক ধারণার ভিত্তিতে এ মডেল দাঁড় করানো হয়েছিল। এর নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগত ভিত্তি নেই।

২. পরিবর্তনমূলক মডেলে অবাধ-নীতিকে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করা হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি প্রচেষ্টার কথা উল্লিখিত হয়নি।

৩. এ মডেলে স্থানান্তরের (অভিগমন) কথা বিবেচনা করা হয়নি।

৪. এখানে জন্মহার ও মৃত্যুহারের ভারসাম্যের কথা বিবেচনা করা হয়নি। এখানে জন্মহার ও মৃত্যুহার হ্রাসের কথা অধিক বিবেচিত হয়েছে।

৫. এ মডেলে উল্লেখ করা হয়, কেবল নগরায়িত স্তরেই জন্মহার কমতে থাকে, কিন্তু ডেনমার্ক-সুইজারল্যান্ড শিল্পায়নের আগেই নিম্ন প্রজননশীলতা অর্জনে সক্ষম হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – জনসংখ্যা

টপিক – ০৮ জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল ও বাংলাদেশ

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল ও বাংলাদেশ

This Topic is important for

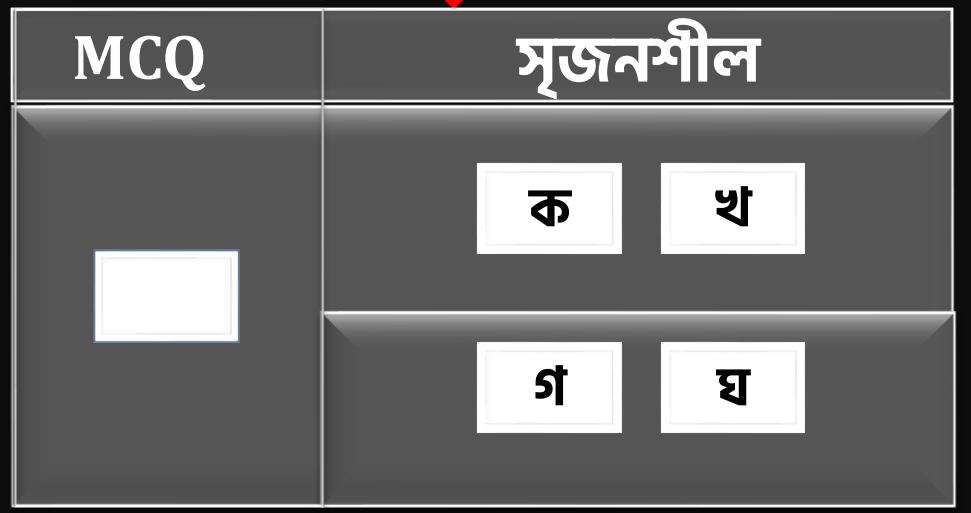

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ এশিয়ায় পঞ্চম ও পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র। ১৯৬৯ সালে এ দেশের জনসংখ্যা ছিল ৫.৫২ কোটি। ১৯৭৪ সালে জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৭,৫৩৯৮,০০০ জন। কিন্তু ২০০১ সাল ও ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দেখা যায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা যথাক্রমে ১২ কোটি ও ১৪ কোটি। সর্বশেষ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ। অর্থাৎ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি এবং এর প্রধান কারণ উচ্চ জন্মহার।

বহর	জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে)	মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জনে
২০১৫	১৮.৮	৫.১
২০১৬	১৮.৭	৫.১
২০১৭	১৮.৫	৫.১
২০১৮	১৮.৩	৫.০
২০১৯	১৮.১	৪.৯
২০২০	১৮.১	৫.১
২০২১	১৮.৮	৫.৭

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল ও বাংলাদেশ

মৃত্যুহার ও জন্মহারের ভারসাম্য দ্বারাই দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নির্ধারিত হয়। বিগত শতকের গোড়ার দিকে জন্মহার ও মৃত্যুহার দুইটিই অধিক থাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ধীরে। যা জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেলের প্রথম ধাপ। চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে বেশি। ফলে বেড়েছে সমগ্র জনসংখ্যা, এটা জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেলের ২য় ধাপ। বর্তমানে এদেশে জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ৩য় ধাপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

বছর	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	বৃদ্ধির হার
১৯৬১	৫৫	২.২৬
১৯৭৪	৭৬	২.৪৮
১৯৮১	৯০	২.৩২
১৯৯১	১১১	২.১৭
২০০১	১৩১	১.৫৪
২০১১	১৫০	১.৩৭
২০২২	১৬৯	১.১২

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল ও বাংলাদেশ

অতএব, দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার উপাত্ত ব্যবহার করে জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেলকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

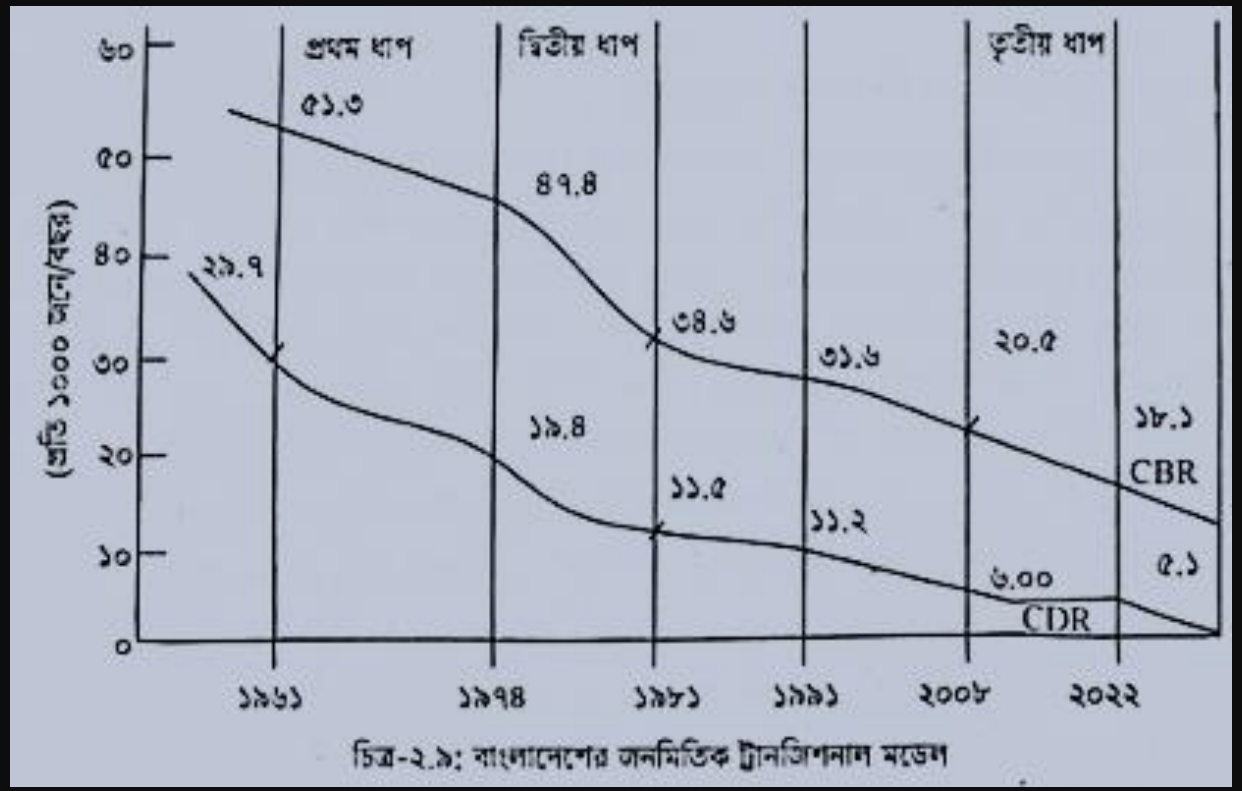

চিত্র-২.৯: বাংলাদেশের জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল

জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল ও বাংলাদেশ

অতএব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই অধিক ছিল, যা এই মডেলের প্রথম পর্যায়, এর পরে মৃত্যুহার জন্মহারের তুলনায় কমতে শুরু করে এবং ২০২২ সালে জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্য কমে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেলের ৪র্থ ধাপে পৌছাবে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। এছাড়াও সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ জনসংখ্যার পরিবর্তনকে একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – জনসংখ্যা

টপিক – ০৯ ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ

ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ

জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population)

জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে কত জন লোক বাস করে তাকে বোঝায়। কোনো দেশের মোট জনসংখ্যাকে সে দেশের মোট আয়তন দ্বারা ভাগ করলেই প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাসকারী লোকসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়। জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্রটি নিম্নরূপ-

জনসংখ্যার ঘনত্ব = মোট জনসংখ্যা ÷ মোট আয়তন।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান অষ্টম কিন্তু আয়তনের দিক দিয়ে এর স্থান বিরানব্বইতম। বর্তমানে এদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১১৯ জন (সূত্র: জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২) এবং এ ঘনত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এদেশের সর্বত্র জনসংখ্যা সমানভাবে বণ্টিত নয়। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি উপাদানের প্রভাব সর্বত্র সমান নয় বলে বিভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বণ্টনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বণ্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Population Distribution in Bangladesh)

বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রধান ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। তবে এদেশের সব জায়গায় জনসংখ্যার সুষম বণ্টন পরিলক্ষিত হয় না। ভূপ্রাকৃতিক কারণে চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়িয়া এলাকায় ও দক্ষিণের বনাঞ্চলগুলোর পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনবসতির ঘনত্ব খুবই কম। অন্যদিকে, নদ-নদী, উর্বর মৃত্তিকা, সমতল ভূভাগ ও নানাবিধ অর্থনৈতিক কারণে ঢাকা, কুমিল্লা ইত্যাদি এলাকায় নিবিড় জনবসতি পরিলক্ষিত হয়।

গ্রামে জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ (Causes and Distribution of Rural Population): দেশের কতিপয় পার্বত্য ও উচ্চভূমি বাদে সমস্ত ভূমিই সমতল ও উর্বর। যেখানে রয়েছে গ্রামীণ জনপদ। এসব সমতল ভূমিতে কম পরিশ্রমে অধিক ফসল উৎপন্ন হয়। এছাড়া প্রতিবছর পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী এবং এদের শাখা নদীগুলো দ্বারা পলি সঞ্চিত হয় বলে জমির উর্বরাশক্তি নষ্ট হয় না। অধিক সার প্রয়োগ না করেও অল্প পরিশ্রম ও অল্প খরচে গ্রামীণ অধিবাসীরা ধান, পাট, আখ ও অন্যান্য শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। তাই গ্রামাঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব অধিক।

ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ

বাংলাদেশ মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত এবং এর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে কৃষিকাজের জন্য পানি সেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না এবং কৃষি উৎপাদন সহজ হয়। এ কারণে গ্রামে জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ঘনবসতিপূর্ণ হয়েছে।

বাংলাদেশে সমতল অঞ্চলে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন: সড়কপথ, রেলপথ এবং জলপথ আছে। অতি সহজে নানা ধরনের যানবাহনে যাতায়াত এবং পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা এ দেশের গ্রামাঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্বের অন্যতম কারণ। এছাড়া সমতল ভূমিতে অধিবাসীদের ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করা সহজতর বলে লোকবসতির ঘনত্ব অধিক।

বাংলাদেশ মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত এবং এর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে কৃষিকাজের জন্য পানি সেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না এবং কৃষি উৎপাদন সহজ হয়। এ কারণে গ্রামে জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ঘনবসতিপূর্ণ হয়েছে।

ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ

বাংলাদেশে সমতল অঞ্চলে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন: সড়কপথ, রেলপথ এবং জলপথ আছে। অতি সহজে নানা ধরনের যানবাহনে যাতায়াত এবং পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা এ দেশের গ্রামাঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্বের অন্যতম কারণ। এছাড়া সমতল ভূমিতে অধিবাসীদের ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করা সহজতর বলে লোকবসতির ঘনত্ব অধিক।

বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার দক্ষিণাংশে জনবসতি অতি বিরল। বান্দরবান জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১০৭ জন, রাঙ্গামাটি জেলায় ১০৬ জন, খাগড়াছড়ি জেলায় ২৬০ জন বসবাস করে।

অন্যদিকে, পদ্মা ও মেঘনার মোহনার নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,০০০ জনের অধিক লোক বাস করে। এটি বাংলাদেশের অতি নিবিড় অঞ্চল। এখানে প্রগাঢ় বা নিবিড় চাষের মাধ্যমে বছরে দুইটি বা কোনো কোনো স্থানে তিনটি ফসল উৎপাদন করা হয়। উর্বর পলল সমৃদ্ধ কৃষিজমির জন্য এ অঞ্চলে জনবসতি খুবই ঘন হয়েছে।

আবার মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং বরেন্দ্রভূমির অনুর্বর জমিতে কৃষিকাজের বিশেষ সুবিধা না থাকায় সেখানে জনবসতি কম। সাবেক সিলেট জেলার 'হাওর' বা বিল এলাকায় জলমগ্নতার দরুন এবং বৃহত্তর দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও যশোরের কোনো কোনো অংশে জমির অনুর্বরতার জন্য জনসংখ্যা তেমন ঘন নয়।

ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ

শহর এলাকায় জনসংখ্যা বণ্টন ও কারণ (Causes and Distrubution of Urban Population): বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং এটি শিল্প ও বাণিজ্যে অনুন্নত। ১৯৭৪ সালের হিসাবে দেখা যায়, বাংলাদেশের জনসংখ্যার মাত্র ৮.৮% লোক শহরে বাস করে। ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩% এ দাঁড়িয়েছে। ১৯৯২ সালে শহরের জনসংখ্যা ছিল ১৫% আর তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে হয়েছে ২৩%। বর্তমানে এদেশে শহরে জনসংখ্যার হার প্রায় ৩১.৬৬% (জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২)।

বর্তমানে এদেশের ৫০০০ ও তার অধিক জনসংখ্যাকে নগরীয় জনসংখ্যারূপে গণ্য করা হয়। অবশ্য ৫০০০ অপেক্ষা কম অধিবাসীর কয়েকটি জনসংখ্যাকে স্থানীয় ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য শহর হিসেবে ধরা হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে ১২টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। এছাড়া ৩৫টির অধিক বৃহৎ নগর (City) রয়েছে যেগুলোর জনসংখ্যা লক্ষাধিক। যথা-

ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ

শহরের নাম	লোকসংখ্যা	শহরের নাম	লোকসংখ্যা
ঢাকা উত্তর	৫,৯৭৯,৫৩৭	ফেনী	৪৮৮,৯৯০
ঢাকা দক্ষিণ	৪,২৯৯,৩৪৫	যশোর	৭১৮,২৩৯
চট্টগ্রাম	৩,২২৭,২৪৬	সিলেট	৫৩২,৪২৬
খুলনা	৭১৮,৯৩৫	ময়মনসিংহ	৫৭৬,৭২২
রাজশাহী	৫৫২,৭৯১	গাজীপুর	২,৬৭৪,৬৯৭
কুমিল্লা	৪৩৯,৪১৪	নারায়ণগঞ্জ	৯৬৭,৭২৪
নাটোর	৩৫৬,৫২৮	বগুড়া	৯৬১,২১৪
রংপুর	৮০৮,৩৮৪	দিনাজপুর	৬৩৩,১৯৮
নরসিংদী	৬৪৩,৮০৯	বরিশাল	৪১৯,৩৫১
বাগেরহাট	৩৮৫,০৯৫		

ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল রাষ্ট্র (৮ম)। এ দেশের আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। তবে এ জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নয়। আয়তনে ছোট বলে জনসংখ্যা বণ্টনের সুনির্দিষ্ট কাঠামো প্রদান করা কষ্টকর। ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা, শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, নগরায়ণ প্রভৃতি নিয়ামক দ্বারা বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে জনসংখ্যার বণ্টন বিশেষভাবে প্রভাবিত।

ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ

জনসংখ্যার ঘনত্বের ভিত্তিতে জনঅধ্যুষিত অঞ্চল (Populated Area of Bangladesh Based on Population Density)

বাংলাদেশের জনঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের পুঞ্জীভবন তথা বসতির নিবিড়তা এক নয়। এ প্রেক্ষিতে অর্থাৎ জনসংখ্যার ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে বেশ কয়েকটি জন অধ্যুষিত অঞ্চলে অথবা সহজ কথায় বসতি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। নিচে ছকে তা দেখানো হলো-

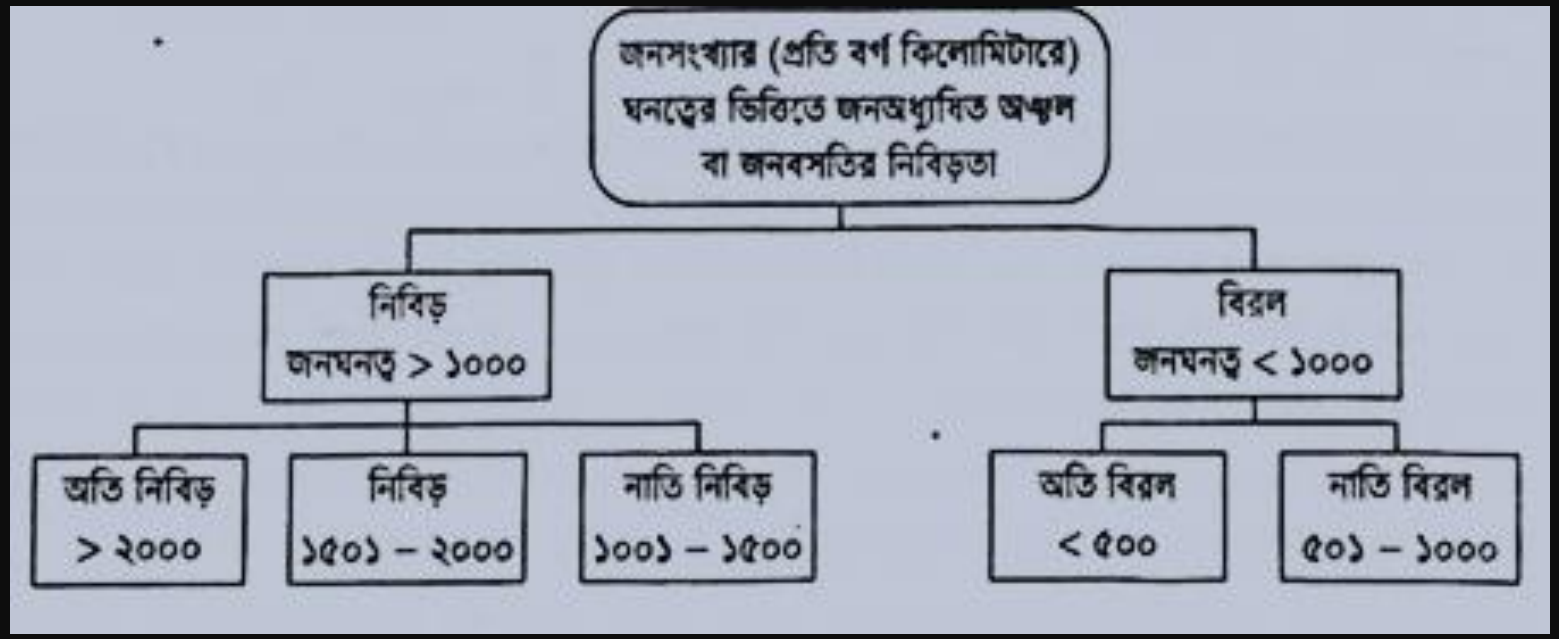

ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ

নিবিড় জন অধ্যুষিত অঞ্চল: বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে জনসংখ্যা প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০০ জনের বেশি সেসব অঞ্চলকে নিবিড় জন অধ্যুষিত অঞ্চল বলা হয়। নিবিড় জনঅধ্যুষিত অঞ্চলকে পুনরায় ৩টি অঞ্চলে ভাগ হয়। যেমন-

১. অতিনিবিড় অঞ্চল: ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী দেখা যায়, বাংলাদেশের ঢাকা জেলা অতিনিবিড় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে ১০০৬৭ জন লোক বাস করে। এছাড়া গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী জেলায় যথাক্রমে জনসংখ্যার ঘনত্ব ২৯১৪, ৫৭১২ ও ২২৪৭। এ জেলাগুলোতে উর্বর সমতলভূমি, কৃষির অনুকূল জলবায়ু ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য জনবসতি অত্যন্ত ঘন।

২. নিবিড় অঞ্চল: চট্টগ্রাম বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী জেলা এবং ঢাকা বিভাগের মুন্সিগঞ্জ জেলা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে কুমিল্লার জনঘনত্ব ১৯৭৪, চট্টগ্রামের ১৭৩৬ এবং মুন্সিগঞ্জের ১৬১৮। এ অঞ্চলে বহু কলকারখানা তথা শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। শিল্প-বাণিজ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়ায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামাঞ্চলের উর্বর মৃত্তিকায় কৃষিকার্যের উন্নতিও ঘনবসতি গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ

৩. নাতি নিবিড় অঞ্চল: এ অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০০ হতে ১৫০০ জনের মধ্যে। কক্সবাজার, লক্ষ্মীপুর (চট্টগ্রাম বিভাগ); ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, মাদারিপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, টাঙ্গাইল (ঢাকা বিভাগ); চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া (খুলনা বিভাগ); জামালপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর (ময়মনসিংহ বিভাগ); বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ (রাজশাহী বিভাগ); গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর (রংপুর বিভাগ) এবং সিলেট বিভাগের সিলেট জেলা নাতি নিবিড় বসতি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

বিরল জন অধ্যুষিত অঞ্চল: ২০২২ সালের শুমারি অনুসারে
বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০০ জনের কম সেসব অঞ্চলকে বিরল বসতি অঞ্চল বলা হয়। এ অঞ্চলের জনঘনত্ব আবার সর্বত্র সমান নয়। কোনো কোনো অঞ্চলে জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০১-১০০০ জন, আবার কোনো কোনো অঞ্চলে জনঘনত্ব ৫০০ এর কম। তাই বিরল বসতি অঞ্চলকে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। যেমন- (১) নাতি বিরল বসতি অঞ্চল ও (২) অতি বিরল বসতি অঞ্চল।

ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ

১. নাতি বিরল অঞ্চল: যেসব অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০১-১০০০ জনের মধ্যে সে অঞ্চলকে নাতি বিরল অঞ্চল বলা হয়। ২০২২ সালের জনশুমারি অনুসারে বরিশাল বিভাগের সকল জেলা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের যথাক্রমে গোপালগঞ্জ, নেত্রকোণা ও নোয়াখালী; খুলনা বিভাগের খুলনা, মাগুরা, মেহেরপুর, নাড়াইল, সাতক্ষীরা; রাজশাহী বিভাগের জয়পুরহাট, নওগাঁ ও নাটোর; রংপুর বিভাগের দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও; সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ এর অন্তর্গত। দেশের দক্ষিণে এবং উত্তর-পূর্বের কিছু অংশে এ অঞ্চলটি নদী, খাল, বিল, হাওড়-বাওড় দ্বারা পরিপূর্ণ। উপরন্তু বিস্তৃত কৃষি অঞ্চল হওয়ায় এখানে জনবসতি বিক্ষিপ্ত এবং ঘনত্ব কম। এছাড়া দেশের উত্তর-পূর্ব দিকে খরাপ্রবণ এ অঞ্চলে জনবসতি কম।

ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ

২. অতি বিরল অঞ্চল: এ অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ০-৫০০ জন। দেশের পার্বত্য জেলাসমূহ তথা খাগড়াছড়ি জেলায় ২৬০ জন, রাঙামাটি জেলায় ১০৬ জন এবং বান্দরবান জেলায় ১০৭ জন লোক বাস করে। পার্বত্য ভূমি, বনাঞ্চল, অনুর্বর ও লবণাক্ত মৃত্তিকা, অনুন্নত পরিবেশ ও যাতায়াত ব্যবস্থা, কষ্টসাধ্য জীবন প্রণালি, হিংস্র জীবজন্তুর ভয় ইত্যাদির জন্য এ অঞ্চলে জনবসতি অতি বিরল। এছাড়া খুলনা বিভাগের বাগেরহাটে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪০৭ জন বাস করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – মানব ভূগোল

টপিক – ১০ বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্যের কারণ

বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্যের কারণ

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্য লক্ষ করা যায়। ভূপ্রাকৃতিক কারণে চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়িয়া অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অন্যদিকে, উর্বর সমতল ভূভাগ ও অর্থনৈতিক কারণে ঢাকা বিভাগে জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক পরিলক্ষিত হয়।

বিভাগ	জনসংখ্যার ঘনত্ব (বর্গকিলোমিটার)
ঢাকা	২,১৫৬
ময়মনসিংহ	১,১৪৬
রাজশাহী	১,১২১
চট্টগ্রাম	৯৭৯
খুলনা	৭৮২
সিলেট	৮৭৩
বরিশাল	৬৮৮
রংপুর	১,০৮৮

বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্যের কারণ

নিচে বাংলাদেশের লোকবসতি ঘনত্বের তারতম্যের কারণসমূহ বর্ণনা করা হলো-

১. ভূপ্রকৃতি: ভূভাগের গঠন প্রকৃতির ওপর জনসংখ্যার বণ্টন বহুলাংশে নির্ভরশীল। উচ্চ পার্বত্য এলাকা অপেক্ষা সমভূমিতে মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সহজ. বলে সমভূমি অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি হয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশের সমতল ভূমি অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক। পক্ষান্তরে, পার্বত্য চট্টগ্রামে লোকবসতি অনেক কম।

২. জলবায়ু: জনসংখ্যা বণ্টনের ওপর জলবায়ুর বিশেষ প্রভাব রয়েছে। অনুকূল সমভাবাপন্ন জলবায়ু বিরাজ করায় বাংলাদেশের সর্বত্র জনসংখ্যার অধিক ঘনত্ব লক্ষণীয়।

৩. মৃত্তিকার উর্বরতা: মৃত্তিকার উর্বরতা জনসংখ্যার বণ্টনকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় কৃষিই এদেশের মানুষের প্রধান উপজীবিকা। কৃষিকাজের জন্য উর্বর মৃত্তিকা অত্যন্ত উপযোগী। ফলে বাংলাদেশের যে সকল অঞ্চলের মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর সে সকল অঞ্চলের লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। অপরদিকে, পাহাড়ি এলাকা, প্রাচীন পাললিক সমভূমি অঞ্চল, ভাওয়াল ও মধুপুরের গড় এবং রংপুর ও দিনাজপুরের অনুর্বর মৃত্তিকা গঠিত অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব কম।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্যের কারণ

৪. বৃষ্টিপাত: বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিকাজের জন্য সময়মতো ও পরিমিত বৃষ্টিপাত একান্ত প্রয়োজন। যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত পরিমিত তথায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। যেমন- বাংলাদেশের পদ্মা ও যমুনা নদীর পশ্চিম তীর অপেক্ষা পূর্ব তীরে পরিমিত বৃষ্টিপাত হওয়ায় কৃষিকার্য সহজভাবে সম্পাদন করা যায়। ফলে এ পাড়ে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি।

৫. সেচ ব্যবস্থা: কৃষিকাজের জন্য পর্যাপ্ত পানি প্রয়োজন। বাংলাদেশের যেসব এলাকায় বৃষ্টিপাত কম কিন্তু সেচ কার্যের সুবিধা রয়েছে সেসব এলাকায় লোকবসতির ঘনত্ব বেশি। যেমন: চাঁদপুর জেলা।

৬. নদী অববাহিকা: নদী অববাহিকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি হয়। কারণ-

ক. নদী পানির উৎস ও সহজে মৎস্য পাওয়া যায়।

খ. জীবনধারণের জন্য সহজেই এখানে চাষাবাদ করা যায়।

গ. যাতায়াতের জন্য সুবিধাজনক।

এসব কারণে বাংলাদেশের পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্যের কারণ

৭. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা: জনসংখ্যা বণ্টনে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব অপরিসীম। যে সকল অঞ্চলে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত তথায় লোকবসতি বেশি। সড়ক, রেল ও 'নৌপথে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের পাহাড়িয়া এলাকা এবং সুন্দরবন ব্যতীত বাংলাদেশের সর্বত্র জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি।

৮. শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য: শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি বা অবনতির ওপর জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে। যে সকল অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকারখানায় উন্নত তথায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি। ফলে জনসংখ্যার ঘনত্বও বেশি।

৯. নগরায়ণ: নগরায়ণের ওপর জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভরশীল। শহরে মানুষের জীবনধারণের উপযোগী সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকায় লোকবসতি অধিক ঘন হয়। যেমন- বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় লোকবসতি সর্বাধিক।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্যের কারণ

১০. খনিজ সম্পদ: বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় সেসব অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। যেমন- সিলেট, কৈলাশটিলা, তিতাস গ্যাস অঞ্চলে লোকবসতি ঘন।

১১. বনভূমির অবস্থান; দুর্গম বনাঞ্চল থাকায় দক্ষিণে সুন্দরবন এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব কম। পার্বত্য রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানেও ঐ কারণে জনবসতি কম।

বাংলাদেশের সমতল উর্বর মৃত্তিকা, সমভাবাপন্ন জলবায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক নগরায়ণ ও শিল্পায়নসহ বহুবিধ অর্থনৈতিক কারণে জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – মানব ভূগোল

টপিক – ১১ বাংলাদেশে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির প্রভাব

বাংলাদেশে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির প্রভাব

বাংলাদেশে জনসংখ্যার অন্যতম সমস্যা হলো দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ১৯৯১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.০১। বর্তমানে এই বৃদ্ধির হার ১.১২% (সূত্র- জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২)। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেলেও এর প্রভাব পড়ছে আমাদের বাসস্থান, আবাদি জমি, খাদ্যশস্য ও যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর। তবে অধিক জনসংখ্যা একটি দেশের জন্য আর্শীবাদ হতে পারে যখন তা অন্য দেশে রপ্তানি করা হয়। নিম্নে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা করা হলো:

১. বাসস্থানের ওপর প্রভাব: বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাসস্থানের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর রিপোর্ট অনুসারে, বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি. এ ১১১৯ জন। সুতরাং, এই বিপুল জনসংখ্যা এত ক্ষুদ্র দেশে বসবাস করতে বহু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। গ্রাম থেকে মানুষ শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে শহরে জনসংখ্যার বাসস্থান সংকুলান সম্ভব না হওয়ায় ঘর বাড়ি আনুভূমিকভাবে গড়ে না ওঠে উল্লম্ব (Vertical) ভাবে গড়ে উঠছে। শহরে অধিক জনসংখ্যার কারণে বেশি মাত্রায় বস্তি সৃষ্টি হচ্ছে যা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহরগুলো যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ইত্যাদি শহরগুলোতে বাসস্থানগুলো উল্লম্বভাবে গড়ে উঠছে। অন্যদিকে, গ্রামাঞ্চলেও জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির কারণে দিন দিন ঘর বাড়ির দূরত্ব কমে আসছে। অর্থাৎ পুঞ্জিভূত বাসস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির প্রভাব

২. আবাদি জমির ওপর প্রভাব: বাংলাদেশে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির কারণে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে আবাদি জমির ওপর। গ্রামাঞ্চলে পূর্বে একটি পরিবারের জন্য যে পরিমাণ জমির ফসলে চাহিদা মিটতো বর্তমানে সেই একই পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে উক্ত জমি বণ্টনের ফলে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে। ফলে ফসলের উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে।

৩. খাদ্যশস্যের ওপর প্রভাব: কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা বিদ্যমান। খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য বাংলাদেশকে প্রতি বছর বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেশের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশের কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির শতকরা হার ৪৮.৪% (সূত্র: জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০২৩ www.bdgov.com]। অথচ এই বিপুল শ্রমশক্তির অদক্ষতা ও অজ্ঞতার কারণে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে না। আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাসও খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাসের একটি কারণ। দ্রুত 'জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি তুলনামূলক অনেক কম। এর প্রভাবে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির প্রভাব

৪. যাতায়াত ব্যবস্থার ওপর প্রভাব: বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি যাতায়াত ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও নগরায়ণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত হচ্ছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে যাতায়াত ব্যবস্থা অর্থাৎ সড়ক, রেলপথ, নৌপথ ও আকাশপথের ওপর প্রচুর চাপ পড়ছে। স্বাধীনতার পর থেকে সড়ক পথের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপের কারণে সড়ক দুর্ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি বছর নৌ পথে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই এর কারণে লঞ্চ ডুবির মতো বড় বড় দুর্ঘটনায় প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ অংশে মোট রেলপথের পরিমাণ ছিল ২,৭০৬ কিলোমিটার। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩১০১ কি.মি. এ দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে রেলপথের সুব্যবস্থাও অনেক সময় দুর্ভোগ ডেকে আনে। অর্থাৎ অতিরিক্ত যাত্রীদের কারণে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি যেকোনো দেশের খাদ্যশস্য, বাসস্থান, আবাদি জমি ও যাতায়াত ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। বাংলাদেশেও দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাসস্থানের সমস্যা, আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস, খাদ্যশস্য ঘাটতি, যাতায়াত ব্যবস্থায় দুর্ঘটনা ইত্যাদি প্রভাব পড়ছে। সর্বোপরি বলা যায়, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি দেশের জন্য কখনই মঙ্গলকর নয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – মানব ভূগোল

টপিক – ১২ প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক

প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক

সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ: যা কিছু নির্দিষ্ট প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং সামাজিক অবস্থায় ব্যবহার করা যায় তাই সম্পদ। ব্যবহার জানার পর অপ্রয়োজনীয় বস্তু মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়। অর্থাৎ, সম্পদ বলতে বুঝায় যার উপযোগ আছে; মানুষের প্রয়োজনে যা ব্যবহৃত হয় এবং যার অর্থমূল্য আছে তাই সম্পদ। অন্যভাবে বলতে গেলে বস্তুর কার্যকারিতাই সম্পদ। সুতরাং প্রকৃতি অবারিতভাবে মানুষের জন্য যা কিছু দান করেছে তা সম্পদ হিসাবে বিবেচিত যখন তা কাজে লাগে। আর এগুলোই প্রাকৃতিক সম্পদ।প্রাকৃতিক সম্পদকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (i) নবায়নযোগ্য ও (ii) অনবায়নযোগ্য সম্পদ। অনবায়নযোগ্য সম্পদ খুব ধীরগতিতে সৃষ্টি হয় এবং সরবরাহের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। যেমন- কয়লা অথবা আকরিক ধাতু। অপরদিকে, নবায়নযোগ্য সম্পদ পুনঃসংগঠনশীল, কিছু ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে বিশেষভাবে পরিবর্তনশীল। যেমন- জলবিদ্যুৎ। প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক: বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশু সম্পদ, পানি সম্পদ, মৃত্তিকা সম্পদ ইত্যাদি সবকিছুই প্রকৃতি প্রদত্ত তথা প্রাকৃতিক সম্পদ। তবে জনসংখ্যা না থাকলে এগুলো অব্যবহৃত থাকে এবং সেক্ষেত্রে তা সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হবে না। প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক বুঝতে আমরা নিচের ছকটি (সারণি-২.১৮) লক্ষ করি। ভূমি বা মাটি, পানি, বনভূমি ইত্যাদি প্রকৃতিপ্রদত্ত। এসব বস্তুর কিছু উপযোগিতা আছে। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের জনসংখ্যা এসব উপযোগিতার ভিত্তিতে যখন তা নিজেদের ভোগে আনে অর্থাৎ সম্পর্ক গড়ে তোলে তখন তা সম্পদে পরিণত হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক

প্রাকৃতিক সম্পদ	উপযোগিতা	জনসংখ্যার সাথে সম্পর্ক
ভূমি	- বসবাসের জায়গা - - কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় - - শিল্প ও অবকাঠামোর ভিত্তি -খনিজ সম্পদের উৎস	- খাদ্য উৎপাদন - কর্মসংস্থান - অর্থনৈতিক উন্নয়ন - জীবনমান উন্নয়ন
পানি	-পানীয় জল সরবরাহ - কৃষিতে সেচ -বিদ্যুৎ উৎপাদন - মাছ চাষ ও জলজ সম্পদ	- স্বাস্থ্য সুরক্ষা - খাদ্য নিরাপত্তা - শিল্প উন্নয়ন - আয় ও কর্মসংস্থান
বনভূমি	- অক্সিজেন সরবরাহ - জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ - কাঠ, ফল ও ওষুধের উৎস - - জীববৈচিত্র্যের আবাস	- পরিবেশ সুরক্ষা - স্বাস্থ্যকর জীবন - প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন - - জীবিকা অর্জন

প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক

দক্ষ জনশক্তিও একটা সম্পদ। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটা অন্যতম খাত হলো বৈদেশিক শ্রমবাজার। বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর অনেক দেশই জনবিরল উন্নত দেশে জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে ভারত। শিল্প শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর থেকে শুরু করে কম্পিউটার বিশারদ, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী সবই 'জনসম্পদের' পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ জনসংখ্যা ও সম্পদের সম্পর্ক সরাসরি। প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ নিজে যেমন সম্পদ তেমনি প্রকৃতির দানকে সরাসরি ব্যবহার করে কিংবা ব্যবহার উপযোগী করে তাকে সম্পদে রূপান্তর করে থাকে। যেমন: মৃত্তিকাকে কর্ষণ করে ফসল না ফলানো পর্যন্ত তা সম্পদ নয়। আবার বনের কাঠ থেকে আসবাবপত্র ও শিল্পজাতদ্রব্য তৈরি না করলে কিংবা তা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার না করলে তা সম্পদের পর্যায়ভুক্ত হবে না।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বনের ফলমূল আহরণ, পশু শিকার, মধু সংগ্রহ, বাঁশ, বেত ও ছনঘাসের ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সম্পদে পরিণত করেছে। তেমনিভাবে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ মাটির নিচ থেকে কয়লা, লৌহ, তামা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তেল, গ্যাস প্রভৃতি আহরণ ও ব্যবহার করে তাদেরকে সম্পদে পরিণত করেছে। বহমান পানি থেকে পানি বিদ্যুৎ কিংবা সূর্যালোক থেকে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন মানুষেরই কীর্তি এবং মানুষের প্রয়োজনেই তা ব্যবহার হচ্ছে। মানুষ যখন গবেষণার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ধরনের উপকরণকে সম্পদে রূপান্তরিত করে তখন এর পরবর্তী ধাপে নতুন প্রজন্মও তাদের এই গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপে তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে নতুন ধরনের সম্পদের অনুসন্ধান করে থাকে। এভাবে ক্রমান্বয়ে সম্পদ থেকে আরও নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানব সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এভাবে সম্পদ সৃষ্টি একটি চলমান প্রক্রিয়া। অতএব বলা যায়, মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষ এবং নতুন প্রজন্ম; এদের মাঝে গতিশীল আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যামান।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক

কাম্য জনসংখ্যা: কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা ও কার্যকর ভূমির অনুপাতে ভারসাম্য থাকলেই তাকে কাম্য জনসংখ্যা (Optimum population) বলে। ঐ দেশের উৎপন্ন সম্পদের দ্বারা জনগণের ভোগ-সুখের বন্দোবস্ত যতক্ষণ বজায় রাখা যায়, ততক্ষণই সেই দেশের কাম্য জনসংখ্যা বিদ্যমান। মোট জনসংখ্যা ও কার্যকর ভূমির আদর্শ অনুপাতের ভারসাম্য যখন নষ্ট হয়, তখনই কোথাও অতি-জনাকীর্ণতা আবার কোথাও জনসংখ্যা স্বল্পতা দেখা দেয়।

অতি-জনাকীর্ণতা: জনসংখ্যার তুলনায় কার্যকর ভূমির পরিমাণ অল্প থাকলে তাকে অতি-জনাকীর্ণতা (Over population) বলে। এর ফলে মোট উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণ, তথা মাথাপিছু উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণ অল্প হয়। যা মাথাপিছু উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ হ্রাস করে।

জনস্বল্পতা: জনসংখ্যার তুলনায় কার্যকর ভূমির পরিমাণ বেশি থাকলেও জনসংখ্যার স্বল্পতার কারণে পর্যাপ্ত সম্পদ এবং ভূমি ব্যবহার না করা গেলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই অবস্থাকে জনস্বল্পতা (Under population) বলে। যেমন-অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা কম।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, জনসংখ্যা ও সম্পদ নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। কোনো ভূখণ্ডে জনবসতি না থাকলে সেখানে প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ সৃষ্টি হবে না। আবার সম্পদে রূপান্তর উপযোগী প্রকৃতির দানসমূহ না থাকলে সেখানে জনবসতি সৃষ্টি কিংবা জনসম্পদও গড়ে উঠবে না। প্রাচীনকাল থেকে উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত নদী তীরবর্তী এলাকায় কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে। আবার নদী ও সমুদ্রপথকে কাজে লাগিয়ে আন্তঃদেশীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। পরবর্তীতে খনি এলাকায় খনিজ উত্তোলনভিত্তিক আবাসন সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ সম্পদ জনসংখ্যা বিকাশের অপরিহার্য উপাদান। কোনো অঞ্চলের সম্পদ যখন জনগণের চাহিদাকে যথাযথভাবে পূরণ করতে পারে না তখন তা অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ হিসাবে গণ্য হয়। জনসংখ্যা তত্ত্ববিদ ম্যালথাসের মতে, ঐ সময় যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, বন্যা কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ অতিরিক্ত জনসংখ্যা গ্রাস করে। তবে পৃথিবীতে জনবহুল দেশের পাশাপাশি সম্পদ পরিপূর্ণ জনবিরল দেশও থাকে। সেক্ষেত্রে প্রাচীনকাল থেকে সম্পদপূর্ণ অঞ্চল বা দেশের দিকে অভিগমন একটা সাধারণ ঘটনা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – জনসংখ্যা

টপিক – ১৩ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. কোন ধরনের পরিবর্তনের জন্য মানুষ অভিবাসনে আগ্রহী হয়?
ক. অর্থনৈতিক খ. সামাজিক গ. রাজনৈতিক ঘ. জনবৈশিষ্ট্যগত

২. 'Migrate' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ থেকে এসেছে?
ক. গ্রিক খ. স্প্যানিশ গ. ল্যাটিন ঘ. ফরাসি

৩. একস্থান হতে অন্যত্র গমন করাকে কী বলে?
ক. 'প্রবাসী খ. অভিগমন গ. অভিবাসী ঘ. অধিবাসী

৪. শহর থেকে গ্রামে অভিগমন হয় কোন দেশগুলোতে?
ক. উন্নত খ. অনুন্নত গ. স্বল্পোন্নত ঘ.উন্নয়নশীল

৫. এক জেলা থেকে অন্য জেলায় অভিগমন কোন ধারার অভিগমন?
ক. স্বল্প দূরত্বে খ. মাঝারি দূরত্বে গ. অধিক দূরত্বে ঘ. অভ্যন্তরীণ

৬. নারীদের সন্তান ধারণ করার ক্ষমতাকে কী বলা হয়?
ক. উর্বরতা খ. প্রজননশীলতা গ. প্রজনন ক্ষমতা ঘ. উৎপাদনশীলতা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৭. অভিবাসন দ্বারা জনগণের জীবনাচারে কী ধরনের পরিবর্তন সম্ভব?
ক. অর্থনৈতিক খ. পরিমাণগত গ. গুণগত ঘ. রাজনৈতিক

৮. রোহিঙ্গারা মূলত কোন দেশ থেকে আগত?
ক. চীন খ. থাইল্যান্ড গ. ভারত ঘ. মিয়ানমার

৯. মহিলাদের অভিগমনের প্রধান কারণ কোনটি?
ক. বিবাহ খ. চাকরি গ. শিক্ষা ঘ. বলপ্রদান

১০. জন্মহার কম দেখা যায় কোথায়?
ক. উন্নয়নশীল দেশে খ. অনুন্নত দেশে গ. গ্রাম অঞ্চলে ঘ. শহরে

১১. কোনটি জন্মহারের বহুল প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি?
ক. সাধারণ মৃতুহার খ. স্বাভাবিক জন্মহার গ. মোট জন্মহার ঘ. স্থূল জন্মহার

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১২. জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেলে কী ব্যাখ্যা করা হয়?

ক. জন্মহার খ. মৃত্যুহার গ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘ. জন্মহার ও মৃত্যুহার

১৩. জনমিতিক ট্রানজিশনাল মডেল এর ব্যাখ্যা প্রদান করেন কে?

ক. স্টিফেন থমসন খ. জন লিংকন গ. ওয়ারেন থমসন ঘ. লজি বেয়ার্ড

১৪. জনসংখ্যার দিক দিয়ে এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. চতুর্থ ঘ. পঞ্চম

১৫. বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক সেসব অঞ্চল কী নামে পরিচিত?

ক. নিবিড় খ. বিরল গ. নাতি বিরল ঘ. অতি বিরল

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – জনসংখ্যা

টপিক – ১৪ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

দক্ষিণ এশিয়ার নদী বিধৌত উন্নয়নশীল একটি দেশে অধিক জন্মহার বিদ্যমান। পূর্ব এশিয়ার অপর একটি উন্নত দেশ যার জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই তুলনামূলকভাবে কম এবং দেশটি শিল্পোন্নত।
[রং বো, কুবো ২০২৫]

ক. প্রজননশীলতা কী?

খ. বান্দরবানের জনসংখ্যার ঘনত্ব কম- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের প্রথমে ইঙ্গিতকৃত দেশটির' উচ্ছ জন্মহারের কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দেশদ্বয়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভিন্ন হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রাকিব কুমিল্লার গ্রামের বাড়ি থেকে চট্টগ্রামে এসে তার বোনের বাসায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। তার ভগ্নিপতি একটি কোম্পানির চাকুরী নিয়ে পাঁচ বৎসর যাবৎ কুয়েতে অবস্থান করছে। [ম. বো., দি. বো, কু. বো, চ. বো., সি. বো, ব. বো. ২০২২]

ক. অভিগমন কী?

খ. জনসংখ্যার অন্যতম উপাদান মৃত্যুহার- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাকিবের অভিগমনের ধরন ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাকিব ও তার ভগ্নিপতির অভিগমনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

'ক' দেশটি জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে ৮ম অবস্থানে রয়েছে। এই দেশের তথ্য অনুসারে-

প্রেক্ষাপট-১: প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১২৬৫ জন বাস করে।

প্রেক্ষাপট-২: প্রতি হাজারে ১৮ জন শিশু জন্মায়।

প্রেক্ষাপট-৩:মোট জনসংখ্যার ৬৬% কর্মক্ষম ও ৪৪% নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী রয়েছে।

[ম. বো, রা. যো, কু. বো, চ. বো, সি. বো, য. বো., ব. বো. ২০২৩]

ক. জনমিতি কাকে বলে?

খ. নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল গড়ে উঠার কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে প্রেক্ষাপট-২ এর জনমিতিক উপাদান নির্ণয়ের সূত্রটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে প্রেক্ষাপট ১ ও ৩ এর উপাদান 'ক' দেশটির উপর কীরূপ প্রভাব ফেলবে? বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU